শিবানন্দ-বাণী

দ্বিতীয় ভাগ

স্বামী অপূর্বানন্দ

সঙ্কলিত

উদ্বোধন কার্যালয়

বাগবাজার, কলিকাতা

দু টাকা আট আনা

প্রকাশক—
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
বাগবাজার, কলিকাতা

১৩৫৩

প্রিণ্টার—
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

শিবানন্দ-বাণীর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হল। পরম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ভাগবত-জীবনের স্পর্শ এই প্রসঙ্গগুলির ভেতর দিয়ে পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে কথঞ্চিৎ সংক্রামিত হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই পুস্তকে সাধারণতঃ দৈনন্দিন আলোচনাগুলি পৃথক পৃথক লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে কোন কোন স্থলে চিন্তাধারার সঙ্গতির জন্য একাধিক দিনের প্রসঙ্গও একত্র সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ গ্রন্থের সঙ্কলন ও প্রকাশে অনেকেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সকলের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এ পুস্তকের সমগ্র আয় বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকরাণীর সেবায় ব্যয়িত হবে। ইতি—

স্নানযাত্রা, ১৩৫৩ — **স্বামী অপূর্বানন্দ**

শিবানন্দ-বাণী

দ্বিতীয় ভাগ

বেলুড় মঠ

অক্টোবর, ১৯১৮

একটী ভক্ত ছেলে স্বপ্নে মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন পেয়ে তাঁকে সে বিষয়ে চিঠিতে জানিয়েছিল। এখন তাঁর অনুমতি নিয়ে কিছুদিন মঠবাস করতে এসেছে। একদিন সকালবেলা মহাপুরুষ সবেমাত্র ঠাকুরঘর হতে ফিরেছেন, ভক্তটী ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাবার প্রার্থনা জানিয়ে বলল—"মহারাজ, আপনি দয়া করে আমায় স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন; আমার প্রাণের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, আপনি কৃপা করে আমায় দীক্ষা দিন।" তাই বলতে বলতে ভক্তটী অশ্রুপূর্ণ লোচনে মহাপুরুষজীর পদযুগল ধারণ করল। ভক্তটীর আগ্রহাতিশয্য দেখে তিনি সস্নেহে বল্লেন—"বাবা, আমি খুব আশীর্বাদ করছি ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে তোমার ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম দিন দিন খুব বর্দ্ধিত হোক। তুমি তাঁর দিকে খুব এগিয়ে যাও। দীক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে—আমি কাউকে দীক্ষা দিইও নি। আমার ভেতর গুরুবুদ্ধি ঠাকুর আদৌ দেন নি। আমি তাঁর সেবক—তাঁর দাস—তাঁর সন্তান। তা ছাড়া দীক্ষা দেবার

জন্য ঠাকুরের কাছ থেকে কোন আদেশ এখনও পাই নি। আমি জানি 'রামকৃষ্ণ' নামই এযুগের মহামন্ত্র। যে ভক্তিভরে পতিতপাবন যুগাবতার ঠাকুরের নাম জপ করবে তার ভক্তি মুক্তি সবই করামলকবৎ। 'রামকৃষ্ণ' এযুগের ডঙ্কামারা নাম। জীবের মুক্তির জন্য রামকৃষ্ণ নাম জপই যথেষ্ট। আর কোন দীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে তো আমার মনে হয় না। যে কায়মনোবাক্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় নেবে, তাঁর নাম জপ করবে, সেই মুক্ত হয়ে যাবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন—জীবকে মুক্তি দেবার জন্য।"

ভক্ত—"ঠাকুরের নাম তো যতটা পারি জপ করছি। তাঁর কাছে প্রার্থনাও করছি। তিনি যে যুগাবতার ভগবান, তাতেও আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আপনি তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্ষদ, আপনার কৃপা পেলে আমার জীবন সার্থক হয়ে যেত—এই আমার দৃঢ় ধারণা।"

মহাপুরুষজী—"আমার তো কৃপা আছেই; নইলে এত বলছি কেন? খুব প্রার্থনা করছি, তোমার কল্যাণ হোক। তাঁর দয়ায়, তাঁর অবতারত্বে যখন তোমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে, তখন আর কোন ভাবনা নেই। তুমি মহাভাগ্যবান—পূর্ব জন্মার্জিত বহু বহু সুকৃতির ফলে ভগবানের যুগাবতারত্বে বিশ্বাস হয়। তোমার তা যখন হয়েছে তখন আর ভাবনা কি? আমি বলছি—আমার কথা বিশ্বাস কর—তুমি এ ভববন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যাবে নিশ্চয়। খুব প্রাণভরে তাঁকে ডাক—কাতরে

প্রার্থনা কর; তিনি তোমার ঐ বিশ্বাস আরও পাকা করে দেবেন এবং ভক্তি বিশ্বাসে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।"

ভক্ত—"জপ কি ভাবে করব? তার কি বিশেষ কোন নিয়ম আছে?"

মহাপুরুষজী—"প্রীতির সঙ্গে বারংবার নাম করাই জপ। তাই করবে এবং করতে করতে আনন্দ পাবে। জপের বিশেষ কোন নিয়ম নেই—সব সময় চলতে, ফিরতে, খেতে, শুতে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্বাবস্থায়ই জপ করা চলতে পারে। আসল জিনিস হল—প্রেম। যত প্রেমভরে তাঁর নাম করবে তত বেশী আনন্দ পাবে। তিনি অন্তর্যামী—তিনি দেখেন প্রাণ। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে—সঙ্গে সঙ্গে তার ফল প্রত্যক্ষ করবে। বালক যেমন মা বাপের কাছে আবদার করে কাঁদে, ঠিক তেমনি করে তাঁর কাছে বিশ্বাস ভক্তি প্রেম চাও, নিশ্চয় পাবে। তিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, পতিতপাবন, কলিকল্মষহারী, পরম কারুণিক, ভক্তবৎসল ও প্রেমময়। খুব তাঁর নাম করে যাও। সব সময় তো যতটা পার জপ করবেই; কিন্তু বিশেষ করে সকাল সন্ধ্যায় নিয়ম করে, নির্দিষ্ট সময়ে, একই স্থানে বসে জপধ্যান করা খুব দরকার। তাই করো।"

ভক্ত—"ধ্যান কি ভাবে করব মহারাজ? ধ্যান করতে চেষ্টা করি; কিন্তু ধ্যান যে কি তাও ভাল বুঝি না, আর ধ্যান তেমন হয়ও না।"

মহাপুরুষজী—"প্রথম প্রথম ধ্যান হওয়া একটু মুস্কিল। তাঁর

কৃপায় তাঁর নাম করতে করতে, প্রার্থনা করতে করতে, যখন তাঁর উপর একটা ভালবাসা আসবে তখন ধ্যান অতি সহজে হয়ে যাবে। প্রথমটা ধ্যান করার চেষ্টা না করে চিরপবিত্র, কামকাঞ্চনবর্জিত, শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্, পরম কারুণিক, যুগাচার্য, জগদ্‌গুরু সেই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমূর্তির সামনে বসে খুব কাতর-ভাবে বালকের ন্যায় কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করবে। বলবে—'প্রভু, তুমি জগতের উদ্ধারের জন্য নরদেহ ধারণ করেছ এবং জীবের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছ ; আমি অতি দীন হীন, ভজনহীন, পূজনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন, প্রেমহীন : দয়া করে আমায় বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতা দাও, আমার মানবজন্ম সফল হোক। তুমি কৃপা করে আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও—আমায় দেখা দাও। তোমারই একজন সন্তান আমায় তোমার কাছে এই ভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। তুমি আমায় কৃপা কর।' এই ভাবে প্রার্থনা করতে করতে তাঁর কৃপা হবে। তখন মন স্থির হয়ে আসবে—জপধ্যান করতে মন বসবে—হৃদয়ে প্রেম, আনন্দ অনুভব করবে, প্রাণে আশার সঞ্চার হবে। এইভাবে খুব প্রার্থনা করে পরে যেমন যেমন বলেছি সেই ভাবে জপ করবে। তাঁর পবিত্র নাম জপ করতে করতে আপনিই ক্রমে ধ্যান হবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব একাগ্রভাবে ভাববে যে তিনি সস্নেহে তোমার দিকে চেয়ে আছেন। সেই ভাবনা একই ভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হলেই ধ্যান। তুমি তাঁর নাম জপ করতে করতে প্রার্থনা করো, 'প্রভু, আমার ধ্যান যাতে হয় এমন করে দাও।' তিনি তাই করে দেবেন—নিশ্চয় জেনো।

তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, মাতা, সখা। যে কোন রকমে প্রেমের সহিত তাঁর শ্রীমূর্তি চিন্তা বা তাঁর গুণ ভাবনা করাই ধ্যান। এখন এই ভাবেই করে যাও, পরে প্রয়োজন মত তিনিই ভেতর থেকে জানিয়ে দেবেন কি ভাবে ধ্যান করতে হবে। খুব ব্যাকুল হয়ে ডাক—খুব কাঁদ। কাঁদতে কাঁদতে হৃদয়ের সব মালিন্য দূর হয়ে যাবে, আর তিনি কৃপা করে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন। এ সব একদিনে বা হঠাৎ হয় না। করে যাও, ডেকে যাও—নিশ্চয়ই তাঁর সাড়া পাবে—আনন্দ পাবে।"

ভক্ত—"ব্যাকুলতাই তো আসে না। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা কি ভাবে বাড়ান যায়, মহারাজ?"

মহাপুরুষজী—"ব্যাকুলতা বাবা, কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। তা আপনা হতেই আসে সময়ে। প্রাণে যত বেশী অভাব বোধ করবে ভগবানের জন্য, ততই হৃদয়ে ব্যাকুলতা বাড়বে। যদি না আসে তো জানতে হবে যে, এখনও সময় হয় নি। মা জানেন কোন্ ছেলেকে কখন খাওয়াতে হবে। যদি দেরী হয় তো মা-ই জানেন যে, সে ছেলেকে দেরী করে খাবার দিতে হবে। তার কি যে কারণ তা তিনিই জানেন। প্রভুই মা। তাঁর ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করে পড়ে থাকতে হবে। তিনি তো আর জাগতিক মায়ের মত নন? তিনি অন্তর্যামী। কোন্ ছেলে আন্তরিক ভাব তাঁকে দেখতে চায় তা তিনি ঠিক জানেন এবং সময় মত দর্শনও দেন। খুব ডেকে যাও, খুব তাঁর নাম

করে যাও। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে পড়ে থাক—যখন যা দরকার তিনি সব দেবেন। পবিত্রতা ধর্মজীবনের ভিত্তি। পবিত্র হৃদয়ে ভগবান শীঘ্র প্রকটিত হন। কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকার চেষ্টা করো। এখন তো তোমার ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবন বড়ই পবিত্র। ঠাকুর পবিত্র হৃদয় ও বিষয়বাসনাহীন ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। যার মনে বিষয়ের দাগ লাগে নি তার শীঘ্র শীঘ্র চৈতন্য হবে। আর দরকার—শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। যেমন যেমন তোমায় বললাম, সরল প্রাণে সব বিশ্বাস করে নিয়ে ঠিক তেমনিভাবে সাধনায় লেগে যাও; দেখবে তাঁর দয়া হবে—খুব আনন্দ পাবে। আসল কথা—কাজ করতে হবে। ঠাকুর বলতেন,—'খালি সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে তো আর নেশা হবে না! সিদ্ধি আনতে হবে—পরিশ্রম করে ঘুঁটতে হবে, সিদ্ধি খেতে হবে—তবেই নেশা হবে।' তেমনি ভগবানের নাম কর, তাঁর ধ্যান কর, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর—আন্তরিক ভাবে; তবেই আনন্দ পাবে।

ভক্ত—"বড় আশা করে এসেছিলাম যে আমায় আপনি কৃপা করে দীক্ষা দেবেন। আপনি আমায় কৃপা করুন মহারাজ।"

মহাপুরুষজী—"বাবা, তোমায় তো বলেছি যে, দীক্ষা সম্বন্ধে এখনও ঠাকুরের কোন আদেশ পাই নি। তুমি দীক্ষার জন্য ভেবো না। আন্তরিক তাঁকে ডেকে যাও—তোমার প্রার্থনা তিনি শুনবেন—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। তোমার দীক্ষা নেবার যখন প্রয়োজন হবে তিনিই সব যোগাযোগ করে দেবেন নিশ্চয়। আমিও আন্তরিক প্রার্থনা করছি প্রভুপদে

তোমার পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ নির্ভরতা হোক; প্রেম পবিত্রতায় তোমার হৃদয় ভরে যাক্, প্রভু তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি করুন। খুব প্রার্থনা করছি।" এই বলতে বলতে চক্ষু মুদ্রিত করে খানিকক্ষণ বসে রইলেন। পরে ভক্তটীর মাথায় দুহাত রেখে চোখ বুজে আশীর্বাদ করলেন। ভক্তটীও হৃদয়ের অত্যধিক আবেগে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল। সে একটু শান্ত হলে তাকে মহাপুরুষজী সস্নেহে নিজের হাতে ঠাকুরের প্রসাদ খেতে দিলেন।

ঐ বৎসর সে সময়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বাগবাজারে মুখার্জি লেনের (বর্তমানে উদ্বোধন লেন) বাড়িতে ছিলেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজও সেখানে ছিলেন। আর বলরাম মন্দিরে ছিলেন শ্রীশ্রীমহারাজ ও পূজনীয় হরি মহারাজ। কয়েক দিন মঠে বাস করার পর ভক্তটী কল্‌কাতায় শ্রীশ্রীমাকে ও ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের দর্শন করতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে মহাপুরুষ মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করতে তিনি বল্লেন, "নিশ্চয় যাবে, খুব যাবে। এত কাছে এলে আর তাঁদের দর্শন করবে না? তোমার মহাভাগ্য যে, এ সময়ে তাঁরা সকলেই কল্‌কাতায় রয়েছেন। এমন সুযোগ বড় একটা হয় না। প্রথম বাগবাজারে যাবে—মাকে দর্শন করবে। তিনি আমাদের সকলের মা। সাক্ষাৎ জগজ্জননী। ঠাকুরের লীলাপুষ্টি করবার জন্য নরদেহ ধারণ করেছেন। তাঁর অবস্থিতি মাত্রেই জগৎ ধন্য হয়ে যাচ্ছে। মাকে আমরা কেউ বুঝতে পারি নি। তাঁর ভাব এত চাপা যে, তাঁকে কে বুঝবে? তিনি মোটেই ধরা দিতে চান না। সাধারণ গৃহস্থের

ঘরের মেয়েদের মত থাকেন—সব কাজকর্ম করেন, ভক্তসেবা করেন। কে বলবে যে তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী! ঠাকুর আমায় একদিন বলেছিলেন, 'ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন আর এই নহবতের মা—অভেদ।' মাকে প্রণাম করে তাঁর কাছে খুব ভক্তি বিশ্বাস প্রার্থনা করবে। তিনি প্রসন্না হলেই জীবের ভক্তি মুক্তি সব হয়। উদ্বোধনে শরৎ মহারাজও রয়েছেন—মায়ের মহাবীর সেবক; তাঁকেও দর্শন করবে। তাঁকে বললেই তিনি মায়ের দর্শন করিয়ে দেবেন। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে পরে বলরাম মন্দিরে যাবে। সেখানে মহারাজ রয়েছেন, হরি মহারাজ আছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে আমার নাম করে বলবে যে, মঠ থেকে আমি তোমায় পাঠিয়েছি তাঁদের দর্শন করতে। তাঁরা খুব আশীর্বাদ করবেন। মহারাজ হলেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ মানসপুত্র। তাঁর আশীর্বাদ পেলে মনে করবে যে, ঠাকুরেরই আশীর্বাদ পেয়েছ। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তি এখন তাঁর ভেতর দিয়ে জগৎ পাচ্ছে। হরি মহারাজ সাক্ষাৎ শুকদেব—মূর্তিমান্ বেদান্ত-স্বরূপ—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এঁরা স্থূল শরীরে যতদিন আছেন ততদিন মানুষ এঁদের দর্শন, পবিত্র সঙ্গ ও আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। এর পরে এঁরা ধ্যানগম্য হয়ে যাবেন। ধ্যান-বলে অতিকষ্টে এঁদের দর্শন পেতে হবে। এ বড় শুভ সময়। খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁদের দর্শন করবে। এই যে এ কয়দিন মঠে রইলে ঠাকুরের স্থানে—গঙ্গাতীরে—এত সাধু মহাত্মাদের সঙ্গ করলে, বাড়ি গিয়ে এসব ধ্যান করবে। তাতে চিত্ত শুদ্ধ হবে। তোমার ভাগ্য ভাল।"

ঢাকা

১৯২২

১৯২২ সালের প্রথম ভাগে মহাপুরুষ মহারাজ ঢাকায় গিয়েছিলেন। ঢাকা মঠে অবস্থানকালীন ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি গৌরাবাস সম্মিলনে যোগদান করেছিলেন। মহাপুরুষজীর শুভাগমনের খবর প্রচারিত হওয়ার পূর্ব হইতেই বহু ভক্ত নরনারী ও মঠের সাধু ব্রহ্মচারীরা তথায় সমবেত হয়েছিলেন। সম্মিলনের রীতি অনুসারে সর্বাগ্রে জনৈক ভক্ত একটি ভজন গান করলেন, "রামকৃষ্ণ চরণসরোজে মজরে মন মধুপ মোর," ইত্যাদি। ভজনের পর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পাঠ হবার কথা থাকলেও সমবেত সকলেই মহাপুরুষজীর উপদেশ শুনবার আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি 'কথামৃত' পাঠ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাই পাঠ হতে লাগল। একস্থানে ঠাকুর সন্ন্যাস জীবনের কঠিন নিয়ম সম্বন্ধে বলছেন, "সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না।" ঐ সময় জনৈক ব্রহ্মচারী মহাপুরুষজীকে প্রশ্ন করলেন, "মহারাজ, ঠাকুর তো বলেছেন যে সাধুর পক্ষে স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত দেখতে নেই; কিন্তু আমাদের তো নানা কাজ কর্মে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত বলতে হয়। এসব অবস্থার ভেতর আমাদের কি ভাবে থাকতে হবে?" মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ মৌন থেকে বল্লেন, "দেখ বাবা! বাড়িতে যখন ছিলে তখন মা, বোন ছিল তো? মা, বোনদের সঙ্গে যেমন সরল প্রাণে মেলামেশা করতে, ঠিক সেই রকম মন নিয়ে এখন স্ত্রীলোকদের সঙ্গে

প্রয়োজন মত কথাবার্তা বলবে। মনে মনে ভাববে যে তারা তোমার মা, বোন। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন কি ভক্ত স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও কথাবার্তা না বলাই ভাল—বিশেষ করে আলাদা ভাবে। পাঁচজনের সামনে কাজকর্মের কথা বলতে পার। তোমরা সাধু হতে এসেছ, নিজের ভাব বজায় রেখে, নিজ আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বদা চলবে। নারী জাতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর অংশ জ্ঞান করবে। এই হল সাধনা।"

ব্রহ্মচারী—"কিন্তু তাতেও যদি মনে কুভাব আসে তো কি করব, মহারাজ ?"

মহাপুরুষজী তদুত্তরে একটু দৃঢ়স্বরে বল্লেন—"যেখানে সেখানে মেয়ে মানুষ দেখলেই যাদের মনে কুভাবের উদয় হয় তারা সাধু হবার তো উপযুক্ত নয়ই, এমন কি লোকসমাজে থাকারও উপযুক্ত হয় নি। তাদের উচিত এমন কোন নিভৃত স্থানে চলে যাওয়া যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ পর্যন্ত দেখতে পাবে না, স্ত্রীলোকের কোন সংস্রব নেই—এবং সেখানে দীর্ঘকাল কঠোর ভাবে জীবন যাপন করে মনের ঐ সকল পশু প্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস করে তবে লোকসমাজে আসা উচিত। সমাজেরও একটা নিয়ম আছে, একটা শৃঙ্খলা আছে।"

আরও খানিকক্ষণ 'কথামৃত' পাঠ হবার পরে জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করলেন—"ভগবান লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা কি ?"

মহাপুরুষজী—"শাস্ত্রে তো ভগবান লাভের উপায় সম্বন্ধে নানাভাবের উপদেশ রয়েছে; কিন্তু শেষ কথা হল শরণাগতি—শরণাগতি। শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করে, সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই।

গীতাতে ভগবান অর্জুনকে যোগ, কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি সব উপদেশ দিয়ে শেষটায় বলছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

এই হল সমগ্র গীতার সার। ভগবান প্রতিজ্ঞা করে বলছেন, 'ধর্ম অধর্ম সব পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ নাও। তাহলে আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করব।' তবে ভগবানে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন ও শরণাগতি একদিনে আসে না। এ বড় কঠিন ব্যাপার। যত পূজা, পাঠ, জপধ্যান, কঠোর সাধনা —সবই একমাত্র 'শরণাগতি' আনার জন্য। সর্বোপরি চাই ভগবৎ-কৃপা। অনন্যমনে তাঁর ধ্যান চিন্তা ও প্রার্থনা করতে করতে তিনি কৃপা করে সেই দুর্লভ শরণাগতি দেন।"

* * * *

অন্য একসময়ে ঢাকা মঠের জনৈক কর্মী খুবই ভারাক্রান্ত প্রাণে মহাপুরুষজীকে নিবেদন জানিয়েছিল—"রাজা মহারাজ আদেশ করেছিলেন, 'আর যাই করিস্, সকাল সন্ধ্যায় জপ করতে ভুলবি নি।' অথচ আমার যেমন কাজ—ভজন ও ক্লাশ ইত্যাদি করা— তাতে তো সপ্তাহের মধ্যে পাচ দিনই সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যায় জপ করার সময় হয় না। এতে মনে বড় অশান্তি হচ্ছে।" তদুত্তরে মহাপুরুষজী বলেছিলেন—"দেখ, ঐ যে ক্লাশ ও ভজন ইত্যাদি কর তা ঠিক জপধ্যানের মত সাধন জ্ঞানে করবে। শ্রীভগবানের ভজন, তাঁর বিষয় পাঠ ও আলোচনা—এ তো ভজন সাধনেরই অঙ্গ। আর এই ভাবটি সর্বক্ষণ মনে জাগরূক রাখবে যে, তুমি তাঁরই কাজ করছ।

তাঁর সেবা জ্ঞানে করলে এতে তোমার পরম কল্যাণ হবে। ক্লাশ ইত্যাদি করে এসে যখনই সময় পাবে নিয়মিত জপধ্যান করতে বসবে —এমন কি শোবার পূর্বেও নিয়মিত জপ করা চাইই। মহারাজের আদেশ ঠিক ঠিক পালন করতে হবে বই কি?"

* * * *

জনৈক ভক্ত মহাপুরুষজীকে প্রশ্ন করেছিলেন—"ঠাকুর বলতেন যে, বাসনার লেশমাত্র থাকলেও ভগবান লাভ হয় না—যেমন সুতোর একটু ফেঁশো থাকলেও তা ছুঁচের ভেতর ঢোকে না। কিন্তু আমাদের মনে তো অসংখ্য কামনা-বাসনা রয়েছে, আমাদের উপায় কি হবে?" মহাপুরুষজী একটু চুপ করে থেকে বল্লেন—"উপায় আছে। চিত্তরূপ সুতোয় ভক্তিবিশ্বাসরূপ তেল জল মেখে কামনা-বাসনারূপ ফেঁশোগুলো বেশ করে রগড়ে নিলেই চিত্ত অনায়াসে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মগ্ন হবে। খুব ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক—তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে প্রাণের আর্তি জানাও। তিনি বড় আশ্রিতবৎসল—শরণাগতকে কখনও ত্যাগ করেন না।"

বেলুড় মঠ

১৯২২

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের চার পাঁচ মাস পরে একদিন বিকেল বেলায় জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন মানসে মঠে আসেন। তিনি অতি ভক্তিভাবে মহাপুরুষজীর পাদবন্দনা করে মেজের উপর উপবেশন করলেন

এবং নিজ পরিচয় দিয়ে বল্লেন—“আমি প্রায় তিন বৎসর পূর্বে রাজা মহারাজকে প্রথম দর্শন করি এবং সে অবধি সুবিধা হলেই তাঁর নিকট আসতাম। তিনি আমায় খুবই দয়া করতেন এবং অনেক উপদেশাদি দিতেন। আমি প্রাণে প্রাণে তাঁকেই গুরুত্বে বরণ করেছিলাম এবং একদিন দীক্ষা নেবার অভিলাষ জানালে তিনি খুবই আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—‘দীক্ষা হয়ে যাবে —তবে এত তাড়াতাড়ি করার কোন প্রয়োজন নেই। এখন যেমন বলে দিচ্ছি তেমনি করে যান। মন তৈরী হোক—তার পরে সব হবে।’ সেদিন সাধনভজন সম্বন্ধে তিনি অনেক উপদেশাদি দিয়েছিলেন। সে অবধি তাঁর নির্দেশানুসারে জপধ্যান একটু একটু করতাম এবং মাঝে মাঝে তাঁকে দর্শন করে যেতাম। কিন্তু আমি এমনই অভাগা যে, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা পাবার সৌভাগ্য আমার হল না। এখন আমার প্রাণের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, আপনি কৃপা করে আমায় দীক্ষা দিন। আপনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত—তাঁর আসনে বসেছেন। তাঁর শক্তি এখন আপনার ভেতর দিয়েই কাজ করছে। আপনি কৃপা করুন, আমায় বিমুখ করবেন না।”

মহাপুরুষজী ঐ ভক্তটীকে পূর্বে কখনও দেখেন নি; কিন্তু তবু তিনি তাঁকে খুবই পরিচিত আপনার জনের ন্যায় সস্নেহে বল্লেন—“আপনি মহাভাগ্যবান যে, মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করেছেন এবং তিনি দয়া করে আপনাকে অনেক উপদেশাদি দিয়েছেন। তিনি যা বলে দিয়েছেন তাই মন্ত্র বলে জানবেন। তাতেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। আর আলাদা করে দীক্ষা

নেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে তো আমার মনে হয় না। খুব কাতর প্রাণে ডাকুন, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করুন—নিশ্চয়ই তাঁর দর্শন পাবেন এবং প্রয়োজন হলে তিনি আপনাকে দীক্ষাও দেবেন। তাঁর কৃপা অমোঘ। তিনি তো আর সাধারণ সিদ্ধ গুরু নন? তিনি হলেন স্বয়ং ভগবানের পার্ষদ। তাঁদের কৃপা-কটাক্ষে জীবের সংসারবন্ধন মুক্ত হয়ে যায়—সাধক সিদ্ধ হয়ে যায়। ভগবান যখন জীবকল্যাণের জন্য নরদেহ ধারণ করে জগতে অবতীর্ণ হন তখন তাঁরা শ্রীভগবানের সঙ্গে আসেন যুগধর্ম প্রচারের জন্য—ভগবানের নরলীলা পূর্ণ করবার জন্য। পৃথক্‌ভাবে তাঁরা বড় একটা আসেন না। তা ছাড়া তিনি গেছেন কোথায়? পাঞ্চভৌতিক দেহটা ছেড়েছেন বই তো নয়? এখন তিনি চিন্ময়ধামে চিন্ময়দেহে ঠাকুরের সঙ্গে রয়েছেন এবং ভক্তদের অশেষ কল্যাণ করছেন। আমি বলছি—আপনি নিশ্চয়ই তাঁর দর্শন পাবেন।

ভক্ত—"মহারাজ, আপনি যা বলছেন তা অতি সত্য। আমিও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। রাজা মহারাজের দেহত্যাগের পর আমার প্রাণে নিদারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল এই ভেবে যে, অমন সদ্‌গুরুর সঙ্গ পেয়েও তাঁর কৃপা লাভ আমার অদৃষ্টে হল না! মন খুবই অশান্ত হয়েছিল। ঠাকুরের কাছে খুবই কাতর প্রার্থনা করছিলাম, তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আজ তিন দিন হল স্বপ্নে মহারাজের দর্শন পেয়েছিলাম এবং তিনি কৃপা করে আমায় মন্ত্রও দিয়েছিলেন; কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরে সে মন্ত্র পুরোপুরি আর স্মরণ করতে পারি নি। খুব চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই হল না। সেই থেকে মনটা খুবই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

শেষটায় অনন্যোপায় হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনাকে দয়া করে এর একটা উপায় করতেই হবে। আমার বিশ্বাস তিনি আপনার ভেতর দিয়েই আমার এ অভাব পূরণ করে দেবেন।” এই বলতে বলতে ভক্তটী খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। মহাপুরুষজী খুবই ধীরভাবে ভক্তটীর সব কথা শুনছিলেন। এখন এই রকম ব্যাকুলতা দেখে তাঁর মুখমণ্ডল করুণায় দীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি ভক্তটীকে পুনরায় আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—“মহারাজ যখন আপনাকে এতটা দয়া করেছেন তখন আপনার কোন ভয় নেই। তাঁর কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি হতাশ হবেন না। যখন সময় হবে, তিনি পুনরায় আপনাকে দর্শন দিয়ে কৃপা করবেন। খুব কাতর প্রাণে তাঁকে ডেকে যান।” কিন্তু ভক্তটী মহাপুরুষজীর আশ্বাসবাণীতে শান্ত না হয়ে মন্ত্র দেবার জন্য তাঁরই নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। অগত্যা কতকটা যেন রাজী হয়ে ভক্তটীকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে তিনি মহারাজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। (তখনও শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দির নির্মিত হয় নি। মহারাজ মঠে যে ঘরে থাকতেন সে ঘরেই তাঁর ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র ছিল এবং সেখানে নিত্য পূজা হত।) প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মহাপুরুষজী মহারাজের ঘরের দরজা খুলে সেই ভক্তটীকে মহারাজের ঘরে আসবার জন্য ইঙ্গিত করে ডাকলেন এবং উভয়ে সে ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। খানিকক্ষণ পরে মহাপুরুষজী একাই মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজ তক্তাপোশের উপর চুপচাপ বসে

রইলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ভক্তটী মহারাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে মহাপুরুষজীকে বল্লেন—"আজ আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। স্বপ্নে রাজা মহারাজ যে মন্ত্র দিয়েছিলেন আপনিও সেই মন্ত্রই আমায় বলে দিলেন। এতেই আমার বিশেষ আনন্দ হয়েছে। তিনি আপনার ভেতর রয়েছেন এ আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছি। এই আশীর্বাদ করুন যেন এ জীবনে ইষ্টদর্শন হয়ে যায়।"

মহাপুরুষজী—"আপনি মহাভাগ্যবান। পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতি আছে বলেই মহারাজ আপনাকে এত দয়া করেছেন—নানাভাবে কৃপা করেছেন। এখন যে বস্তু পেয়েছেন তা নিয়ে সাধনভজনে ডুবে যান। আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। প্রকৃত ভক্ত সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে বেড়ালের ছানার মত পড়ে থাকে; আর কেঁদে কেঁদে ডাকে—তাঁর নিকট কাতর প্রার্থনা জানায়। তিনিই জানেন তাঁর ভক্তকে কখন দর্শন দিতে হবে। তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর দুয়ারে পড়ে থাকুন—আর কায়মনোবাক্যে পূর্ণ ভক্তিবিশ্বাস ও প্রেমপ্রীতি সব প্রার্থনা করুন; তিনি আপনার হৃদয় পূর্ণ করে দেবেন।"

ভক্ত—"ধ্যান জপ কি ভাবে করব সে সম্বন্ধে একটু উপদেশ দিন। সংসারে নানা কাজের ভেতর সর্বদা জড়িত থাকতে হয়। তা ছাড়া চাকরির দায়িত্বও ভীষণ। এসব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাতে ভগবানকে ডাকতে পারি তাই আশীর্বাদ করুন।"

মহাপুরুষজী—"আমাদের আশীর্বাদ তো আছেই। আপনাকেও একটু রোক করে ভজন-সাধনে লাগতে হবে। আজ যে মন্ত্র

পেয়েছেন তাই নিয়মিতভাবে জপ করে যান; আর জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করবেন—'প্রভু, তোমার ধ্যান যাতে হয়, আর তোমার শ্রীপাদপদ্মে মন যাতে লীন হয়, তাই করে দাও।' তিনি তাই করবেন—নিশ্চয় জানবেন। তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, প্রভু, পিতা, মাতা, সখা এবং জীবের সর্বস্ব। সংসারে যাদের আমার আমার বলে লোক কাঁদছে, তারা সবই দুদিনের—চিরসাথী একমাত্র তিনিই। আপনি একমনে খুব নাম জপ করে যান; দেখবেন ক্রমে আপনা হতেই ধ্যান হয়ে যাবে। খুব প্রেমের সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে ক্রমে প্রাণে এক বিমল আনন্দের অনুভব হয়। সেই আনন্দ স্থায়ী হলে তাও এক রকমের ধ্যান। ধ্যানের বহু প্রকার আছে। খুব প্রেমের সঙ্গে প্রভুর জ্যোতির্ময় শ্রীমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করবেন; আর ভাববেন যে, তাঁর শ্রীঅঙ্গজ্যোতিঃতে আপনার হৃদয়কন্দর আলোকিত হয়ে গেছে। এই রকম ভাবনা করতে করতে এক অপূর্ব আনন্দে মনপ্রাণ ভরে যাবে। ক্রমে ক্রমে মূর্তিও লয় হয়ে যাবে এবং কেবল চৈতন্যময় এক প্রকার আনন্দ অনুভূত হবে—এও এক প্রকারের ধ্যান। আরও কত রকমের ধ্যান আছে—পরে পরে আপনি নিজেই সব উপলব্ধি করবেন। আসল কথা হল আন্তরিক ভাবে তাঁকে ডাকা। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, কাঁদতে কাঁদতে মনের ময়লা সব ধুয়ে যাবে, মন শুদ্ধ হবে। তখন সেই সংস্কৃত মনই গুরুর কাজ করবে। আপনার কখন কি প্রয়োজন, কি ভাবে ধ্যান করতে হবে, তাঁকে কি ভাবে ডাকতে হবে, সে সব ভেতর থেকেই জানতে পারবেন।

ঠাকুরের কথায় পড়েছেন তো? তিনি বলতেন—'কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' এই পাল তুলে দেওয়া মানে আন্তরিক অধ্যবসায় সহকারে সাধন ভজন করা। তিনি সদাই কৃপা করবার জন্য বসে আছেন—যেমন মা অবোধ শিশুকে কোলে তুলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে থাকেন, তেমনি। একটু করে দেখুন—তবেই তাঁর কত কৃপা তা অনুভব করতে পারবেন।"

ভক্ত—"সংসারে কি ভাবে থাকতে হবে তা সব সময় বুঝে উঠতে পারি না। সকলের মন জুগিয়ে চলা, এ এক মহা কঠিন ব্যাপার।"

মহাপুরুষজী—"ঠাকুরের 'কথামৃত' পড়েছেন তো? বেশ ভাল করে পড়বেন। এ সব সমস্যার অতি সুন্দর সমাধান ঠাকুরের নিজের কথায়ই পাবেন। এ সংসার তো আমারও নয়, আপনারও নয়। এ সংসার সৃষ্টি করেছেন ভগবানই। যাদের আপনি 'আমার' মনে করছেন তারা সবই ভগবানের—এই ভাব নিয়ে সংসারে থাকতে হবে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজন—সবই ভগবানের জীব। তাদের যতটা সেবা করবেন ঠিক নারায়ণ-বুদ্ধিতেই করবেন—তা হলে আর বেশী জড়িয়ে পড়তে হবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে চাই বিচার। সদসৎ বিচার দ্বারা বৈরাগ্যের উদয় হয়। আপনারা গৃহস্থাশ্রমে রয়েছেন—বেশ তো। তা বলে খুব বেশী জড়িয়ে পড়তে হবে কেন? সকলের প্রতি যতটুকু কর্তব্য আছে ততটা অবশ্য করবেন—কিন্তু সেবা-জ্ঞানে। আপনার ওপর তো ভগবানের অশেষ দয়া। কত লোক 'হা অন্ন, হা অন্ন' করে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে—পেটের চিন্তায়ই অস্থির,

ভগবানকে ডাকবে কখন? কিন্তু আপনার তো খাওয়া পরার ভাবনা করতে হয় না—একি কম দয়া? যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, ভগবান তাদের সব সুবিধে করে দেন। যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়বে সেই সময় গভীর রাতে উঠে একান্ত মনে ভগবানকে ডাকবেন—তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাবেন। খুব কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে প্রাণের বেদনা জানাবেন। মহানিশা সাধন ভজনের প্রকৃষ্ট সময়। আপনার লক্ষণ ভাল—আপনার হবে; তাই এত করে বলছি। প্রথমটায় কিছু ভাল করে খাটুন—দেখবেন বিমল আনন্দে মনপ্রাণ ভরে যাবে—আনন্দের নেশায় মশ্‌গুল হয়ে যাবেন। জাগতিক ভোগে কি ছাই আনন্দ আছে? ভগবদানন্দের এক কণাও যদি কেউ পায় তো তার কাছে এ সংসারসুখ আলুনি বোধ হয়।"

ভক্ত—"জপ সংখ্যা রেখে করতে হবে কি? কত জপ করব, কি ভাবে করব, তা দয়া করে একটু বলে দিন।"

মহাপুরুষজী—"জপ তিন রকমে করা যেতে পারে। মালাতে, হাতের করে বা মনে মনে। মনে মনে জপ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জপ। তুলসীদাস বলেছেন—'মালা জপে শালা, কর জপে ভাই, মন মন জপে তো বলিহারি যাই।' মনে মনে জপ করার অভ্যাস করলে চলতে ফিরতে, খেতে শুতে সব সময়ই জপ করা যেতে পারে। কিছু কাল ঐ ভাবে মানস জপের অভ্যাস করলে তখন এমন কি ঘুমের সময়ও জপ ঠিক চলতে থাকবে এবং সর্বক্ষণ মনে একটা আনন্দের ধারা বইবে। তবে প্রথম প্রথম সংখ্যা রেখে জপ করাই ভাল; এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন অন্ততঃ

দুবার করে আসনে বসে নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ করবেন আর এক একবারে হাজারের যেন কম না হয়—তার বেশী যত পারেন ততই ভাল। সংখ্যা করেও রাখা চলে বা মালায়ও রাখা যায়। (এই বলে তিনি কি ভাবে 'করে' জপ করতে হয় তা ভক্তটীকে দেখিয়ে দিলেন।)

"ঠাকুর বলতেন 'নাম নামী অভেদ'। ইষ্টমন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টমূর্তিও চিন্তা করবেন—এই ভাবে জপ ও ধ্যান এক সঙ্গেই হতে পারে। ভগবান অন্তর্যামী—তিনি দেখেন প্রাণ। তিনি সংখ্যাও দেখেন না, সময়ও দেখেন না। ঠিক ঠিক আন্তরিক-ভাবে একবারও যদি ভগবানের নাম নেওয়া যায় তাতে উড়ো উড়ো মন নিয়ে লক্ষ জপের চাইতেও বেশী ফল হবে Intensity (তীব্রতা) চাই, ব্যাকুলতা চাই, আর চাই আন্তরিকতা। প্রাণে ব্যাকুলতা এলে শীগ্গিরই হয়ে যাবে। এসব একদিনে হয় না—ঝোঁক করে লেগে পড়ে থাকুন, ক্রমে সব হবে। আর মাঝে মাঝে মঠে আসবেন। এখানে অনেক সাধু রয়েছেন—সাধু সঙ্গ করবেন। সাধুদের দর্শন করলেও প্রাণে ভগবদ্ ভাবের উদ্দীপন হয়। সাধন ভজন করতে করতে মনে কোন সন্দেহের উদয় হলে আমায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ঠাকুর তো সেই জন্যই আমাদের এখানে রেখেছেন। তবে কি জানেন—Sincerity (আন্তরিকতা) থাকলে বেশী সন্দেহ আসে না—আর এলেও তিনি ভেতর থেকেই সব জানিয়ে দেন। সরলতা, আন্তরিকতা ও পবিত্রতা—এই হল ধর্মজীবনের প্রধান ভিত্তি। পড়েছেন তো রত্নাকর দস্যু 'মরা মরা' জপ করে সিদ্ধ হয়ে গেলেন।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস—বালকের মত বিশ্বাস চাই। যত সন্দেহ কেবল বাইরে; কিন্তু মন যখন অন্তর্মুখী হয়, ক্রমে অন্তরতম প্রদেশে চলে যায়, তখন খালি আনন্দ। ভগবৎ প্রেমে হৃদয় ভরে যায়। অবশ্য সব সন্দেহের নিরাস ভগবদ্দর্শন না হলে হয় না।

'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' " *

বেলুড় মঠ

মে, ১৯২৩

আজ সিন্ধুদেশবাসী জনৈক ভক্তের দীক্ষা হয়েছে। ভক্তটী ইতঃপূর্বে স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছিলেন; কিন্তু তার মর্ম কিছু বুঝতে না পারায় ঐ মন্ত্র পাওয়া অবধি তাঁর মন খুবই অস্থির হয়ে পড়ে। তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠির দ্বারা তাঁর মনের অবস্থা জানিয়ে তাঁকে দর্শন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অনুমতি পেয়ে ভক্তটী সুদূর সিন্ধুদেশ হতে প্রাণের আবেগে বেলুড় মঠে মহাপুরুষজীর চরণপ্রান্তে ছুটে এসেছেন।

গঙ্গাজলে হাত মুখ ধুয়ে নববস্ত্র পরিধান করে বেলা প্রায় দশটার সময় মহাপুরুষজী ঠাকুরঘরে গেলেন এবং যথাবিধি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি সমাপনান্তর সেই সিন্ধী ভক্তটীকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষাদি শেষ করে ছাদের উপর দিয়ে ঠাকুরঘর হতে

* সেই কার্য ও কারণরূপী ব্রহ্ম দর্শন করলে দ্রষ্টার হৃদয়-গ্রন্থি বিনষ্ট হয়ে যায়, সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হয়ে যায় এবং তার কর্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

নিজ প্রকোষ্ঠে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডলে এক দিব্য আভা ফুটে বেরুচ্ছিল। যথারীতি চেয়ারে উপবেশন না করে ভাবাবেশে টলতে টলতে হাততালি দিয়ে গাইতে লাগলেন—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কোয়লা কী ময়লা ছুটে যব্ আস্ করে পরবেশ।"

সে যে কী তন্ময়তা, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! অর্ধনিমীলিত চক্ষু; মন যেন কোন্ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করছে; আর তিনি তদ্গতচিত্ত হয়ে সারা ঘরময় পায়চারী করে এ দুলাইন মাত্র গাইছেন। মুখমণ্ডল রক্তিমাভ—যেন জোর করে কখনও একটু চোখ মেলে পশ্চিম দেয়ালে স্থাপিত ঠাকুরের বড় ছবিখানির দিকে এক একবার একটু তাকাচ্ছেন। বাহ্য-জগতের কোনই হুঁশ নেই। তাঁর স্বভাবমধুর কণ্ঠস্বর হৃদয়ের গভীর প্রেমে সিক্ত হয়ে আরও মিষ্টি শোনাচ্ছিল। যেন সুধা বর্ষণ করছে! অনেকক্ষণ ঐভাবে কেটে গেল। শেষটায় এলো-থেলো ভাবে নিজ চেয়ারে উপবেশন করে চক্ষু মুদ্রিত করে বসে রইলেন। মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে হৃদয়ের অন্তস্তল হতে— "জয় প্রভু! দীনশরণ! করুণাময় প্রভু! জয় মা!" উচ্চারণ করছিলেন।

দীক্ষিত ভক্তটী মহাপুরুষজীর নির্দেশানুসারে এতক্ষণ ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন। ভক্তটী ঠাকুরঘর হতে এসে খুব ভক্তিভরে মহাপুরুষজীকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে তাঁর চরণতলে উপবেশন করে করযোড়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন—

"আপনার দয়ায় আজ আমি প্রাণে শান্তি লাভ করেছি। স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া অবধি মন বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে পাগলের ন্যায় হয়ে গিয়েছিলাম। আজ আপনার মুখ থেকে সেই স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রই পেয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখেছিলাম সবই সত্যি এবং স্বপ্নে আমার যিনি কৃপা করেছিলেন তিনি আপনিই।"

মহাপুরুষজী—"বাবা, ঠাকুর তোমাকে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় দেবেন বলেই তোমায় স্বপ্নে কৃপা করেছিলেন। আবার আজও ঠাকুরই অন্য রূপে তোমায় কৃপা করেছেন। তিনি কৃপাময়—অহৈতুক কৃপাসিন্ধু। জীবোদ্ধারের জন্যই এযুগে নরদেহ ধারণ করে এসেছেন। আমি তাঁর চরণাশ্রিত দাস মাত্র। কৃপা করবার মালিক তিনি। স্বয়ং ভগবানই কৃপা করতে পারেন—আমি তো এই জানি। শাস্ত্রেও আছে যে, যখন সদ্‌গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন তখন স্বয়ং ভগবানই সেই গুরুর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে শিষ্যের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করেন। স্বয়ং ভগবানই গুরু। মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। তোমার পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে পতিতপাবন পরম দয়াল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পেলে। আজ আমি তোমাকে তাঁর চরণে সঁপে দিয়েছি—তাঁর চরণে উৎসর্গ করেছি। আজ হতে ঠাকুর তোমার ইহকাল ও পরকালের সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন।"

ভক্ত—"আমি তো, মহারাজ, ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছিনে। আমি জানি যে, আপনিই কৃপা করেছেন।"

মহাপুরুষজী—"তা তুমি ভাবতে পার; কিন্তু আমি জানি

যে, ঠাকুরই তোমায় কৃপা করেছেন। আজ হতে তুমি তাঁর হয়ে গেলে। এখন হতে ঠাকুরকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। অন্তরে বাইরে তাঁকে দেখবার চেষ্টা কর। তাঁকে খুব আপনার মনে করবে। এ সংসার তো দুদিনের। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন—এ সব সম্বন্ধই মায়িক—দুদিনকার। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ তা চিরকালের, দেহের নাশে সে সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। আজ যে অমোঘ বীজ তোমার হৃদয়ে বপন করা হল তা প্রেমভক্তিরূপ বারিসিঞ্চনে দিন দিন বর্ধিত হয়ে ক্রমে মহা অমৃতবৃক্ষে পরিণত হবে এবং তোমার জীবনে চতুর্বর্গ ফল দান করে তোমার সমগ্র জীবন মধুময় করে দেবে, তুমি পূর্ণ-কাম হয়ে যাবে।"

ভক্ত—"আমি তো মায়ামুগ্ধ সংসারী জীব। নানা বন্ধনের ভেতর পড়ে আছি। সংসার-বিপাকে ডুবে গিয়ে যাতে আপনার শ্রীচরণ ভুলে না যাই এই আশীর্বাদ করুন। সংসারে কি ভাবে থাকতে হবে—যাতে একেবারে ডুবে না যাই সে বিষয়ে একটু উপদেশ দিন। এ অধমকে যে করেই হোক ত্রাণ করতে হবেই।"

এই বলে ভক্তটী সাশ্রুনয়নে মহাপুরুষজীর চরণযুগল ধারণ করলেন। ভক্তটীর ব্যাকুলতা দেখে তাঁর প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে করুণার ছবি ফুটে উঠল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে স্নেহভরে বল্লেন—"বাবা, তোমাকে তো বলেছি যে আজ তোমায় ঠাকুরের চরণে সঁপে দিয়েছি, আর তিনি তোমায় গ্রহণ করেছেন ও তোমার সব ভার তিনি নিয়েছেন। তোমাকে গ্রহণ করবেন বলেই তো তোমার প্রাণে দিব্য প্রেরণা দিয়ে এখানে এনেছেন। আজ তোমার

নবজীবন লাভ হল। ঠাকুর যদি সত্য হন তো আমরা যা বলছি তাও সত্য। তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে, তোমার সমস্ত ভার তাঁর উপর সঁপে দিয়ে ঠাকুরকে কাতর প্রাণে ডেকে যাও। বাস্, আর কিছু করতে হবে না। তিনি সর্বাবস্থায় তোমায় দেখবেন। আর যে সংসারে কি ভাবে থাকতে হবে জিজ্ঞাসা করছ, তা ঠাকুরের কথাতেই আছে। সংসারের সব কাজ করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে। যেমন বড়মানুষের বাড়ির দাসী —সব কাজ কচ্ছে কিন্তু সারাটা মন পড়ে আছে দেশে নিজের বাড়ির দিকে। তেমনি সংসারে থাকতে হবে অনাসক্ত হয়ে। স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন সকলেরই সেবাযত্ন করবে; কিন্তু প্রাণে-প্রাণে জানবে যে, তোমার একমাত্র আপনার জন শ্রীভগবান। তিনি ছাড়া তোমার আর আপনার কেউ নেই। তা বলে স্ত্রী-পুত্রদের অবহেলা করবে না। তাদের ভগবানের প্রেরিত জীবজ্ঞানে, ভগবানের অংশজ্ঞানে যথাশক্তি সেবা করবে। তাদের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ করবে এবং তাদের মনও যাতে ভগবন্মুখী হয় তার চেষ্টা করবে। সংসারে থাকবে; কিন্তু মন যেন সংসারে আবদ্ধ হয়ে না থাকে। আর ঠাকুর বলতেন—'বিচার করা খুব দরকার। সংসার অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও সত্য বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। কিন্তু তাতে ভগবান লাভ হয় না। অতএব টাকা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার।' খুব বেশী worldly ambition (সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা) মনে স্থান পেতে দিও না। সাধারণভাবে জীবন

যাত্রার বন্দোবস্ত তো করে নিয়েছ; তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। মনের স্বাভাবিক গতিই নিম্নদিকে—কামকাঞ্চন ও মানযশের দিকে। সেই ছড়ানো মনকে গুটিয়ে এনে শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে লীন করতে হবে। জীবনে সব চাইতে বড় ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) ভগবান লাভ। সেই ambitionই মনে সর্বক্ষণ রাখবে এবং সে লক্ষ্যে যাতে পৌঁছতে পার তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।"

এমন সময় প্রসাদ পাবার ঘণ্টা পড়তেই মহাপুরুষজী ভক্তটীকে প্রসাদ পেতে যেতে বল্লেন। খানিক পরে জনৈক সেবক শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ মহাপুরুষজীর আহারের জন্য নিয়ে এল। তিনি খাবার আসনে বসলেন কিন্তু আজ দীক্ষা দিয়ে ঠাকুরঘর হতে আসার পর হতেই খুব অন্তর্মুখভাব—কেমন যেন একটা নেশার ঘোর লেগেই আছে। চক্ষু প্রায় নিমীলিত। আহারের দিকে আদৌ মন নেই—অভ্যাসবশতঃ নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সামান্য খাচ্ছেন মাত্র। একটু কথাবার্তা বললে হয়তো তাঁর মন খাওয়ার দিকে আসতে পারে এই ভেবে সেবক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটু প্রসঙ্গের অবতারণা করার উদ্দেশ্যে বলল—"মহারাজ, আজ দীক্ষা দিতে ঠাকুরঘরে অনেকক্ষণ থাকতে হয়েছিল।" মহাপুরুষজী যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় একটু চমকে উঠে বল্লেন—"হাঁ। আহা, লোকটী খুবই ভক্তিমান! ওর উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা আছে; তা না হলে অত ভক্তি হয় না। কার কেমন আধার, দীক্ষা দেবার সময় বেশ বুঝতে পারা যায়। যাদের আধার খুব ভালো তারা মন্ত্র পাওয়া মাত্রই বিহ্বল

হয়ে পড়ে—অশ্রু, পুলক, কম্পন এই সব হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে ওঠে, আর সহজেই ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। এ ভক্তটীকেও দেখলাম তাই। মন্ত্র শোনা মাত্রই সর্বাঙ্গে কম্পন ও একটু পরেই পুলক হতে লাগল এবং ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ল। আর কী প্রেমাশ্রু! দু চোখের কোণ দিয়ে ধারা বয়ে পড়ছিল। তাই দেখে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল। ঠিক ঠিক ভক্তকে মন্ত্র দিয়ে খুবই আনন্দ হয়—মন্ত্র দেওয়া সার্থক হয়। যাদের মন্ত্র পাবার ঠিক সময় হয়েছে তাদের হৃদ্‌পদ্ম যেন মন্ত্র পাবার জন্য বিকশিত ও উন্মুখ হয়ে থাকে এবং মন্ত্র পাওয়া মাত্র উহা যেন সযত্নে আঁকড়ে ধরে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ঠাকুরের দয়ার কথা। আহা! তিনি কত ভাবে কত লোককে কৃপা করছেন। দেশবিদেশের কত লোক যে তাঁর কৃপা পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ধন্য প্রভু!"

সেবক—"দীক্ষামন্ত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের তো মহারাজ, এতটা উদ্দীপন হয় না। যাদের অত উচ্চ আধার নয় আপনাদের কৃপা পেয়ে তাদের কি কোন কল্যাণ হবে না?"

মহাপুরুষজী—"তা কেন হবে না? তাদেরও হবে, তবে একটু দেরীতে হবে। সিদ্ধগুরুর এমন শক্তি আছে যে, শিষ্যের মনকে তৈরী করে নিতে পারেন এবং খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাদের জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। সিদ্ধমন্ত্রের শক্তি অমোঘ; বিশেষ করে সেই সিদ্ধ-মন্ত্রশক্তি যদি আত্মজ্ঞ গুরুর ভেতর দিয়ে সংক্রামিত হয়। ঠাকুর বলতেন—সদ্‌গুরুর কৃপা হলে জীবের অহংকার তিন ডাকে

ঘুচে যায়। আর গুরু কাঁচা হলে শিষ্যের সংসার বন্ধন কাটে না, শিষ্য মুক্ত হয় না।"

বেলুড় মঠ

শনিবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩

সকাল বেলা। মহাপুরুষ মহারাজ সবেমাত্র ঠাকুরঘর হতে ফিরেছেন। এখনও আপনভাবে তন্ময়। গুণ গুণ করে গান গাইছেন। মৃগচর্মের আসনখানি বগলে নিয়ে ছাদের উপর দিয়ে ঠাকুরঘর হতে আসার সময় দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে কর-যোড়ে প্রণাম করেছেন এবং পরে গঙ্গা প্রণাম করে নিজের ঘরে এসেছেন। মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ ধ্যানজপাদি সমাপনান্তে একে একে তাঁকে প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। তিনি কারও সঙ্গে কোন কথাবার্তা এখনও কইছেন না। ভাবে আত্মস্থ; চুপচাপ বসে আছেন। কিছু পরে জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী এসে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে কুশল প্রশ্নাদি করলেন। ঐ সন্ন্যাসী মঠের কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। মহাপুরুষজীর সঙ্গে মঠের কাজকর্ম বিষয়ে সামান্য আলাপের পর দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে কথার অবতারণা করে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা মহারাজ, এই যে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাদি সব রিসিভারের হাতে গেল এতে ভাল হবে কি?"

মহাপুরুষজী—"মনে হচ্ছে তো ভালই হবে। ইদানীং মায়ের সেবা পূজাদির বড়ই বিশৃঙ্খলা হচ্ছিল। তাই বোধ হয় মায়ের

তেই এ ব্যবস্থা হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর কি কম স্থান গা? স্বয়ং ভগবান জীব-কল্যাণের জন্য নরদেহ ধারণ করে ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করে গেছেন। আর এমন সাধনা যা জগতের ইতিহাসে পূর্বে কখনও হয় নি—ভবিষ্যতেও বোধ হয় হবে না। দক্ষিণেশ্বরে সকল তীর্থের সমাবেশ; ও-স্থানের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, আবার শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সব ধর্মের সকল মতের সাধকদের কাছেই ঐ স্থান মহাতীর্থ। জগতে যেসব তীর্থস্থান আছে তাতে কোথাও হয় তো একজন সাধক কোন ভাবে সাধনা করে সিদ্ধ হয়ে গেছেন, কোথাও বা কোন সিদ্ধপুরুষ দেহত্যাগ করেছেন—এই রকম। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর স্বয়ং ভগবানের সাধনা-পীঠ। ও-স্থানে কত রকম আধ্যাত্মিক ভাবের যে বিকাশ হয়েছে তার ইতি কে করে? কালে ঐ স্থানের মাহাত্ম্য লোকে বুঝবে; তখন ওখানকার ধূলিকণা নিয়ে কাড়াকাড়ি হবে। ঐ স্থানের ঘনীভূত আধ্যাত্মিক আবহাওয়া নষ্ট হবার নয়। যখন থেকে শুনেছি যে, দক্ষিণেশ্বরে মায়ের সেবাপূজা ও ভোগরাগাদি ঠিক ঠিক হচ্ছে না তখন থেকেই আমি রোজ মাকে এখানে আহ্বান করে মনে মনে তাঁর পূজা ও ভোগাদি এখানেই নিবেদন করছি। মাকে বলি—'মা, তুমি খাওয়া দাওয়া এখানেই কর। আমাদেরই সেবা গ্রহণ কর।' ওখানকার মন্দিরের সেবাপূজাদির সব সুব্যবস্থা হয়ে যায় তো নিশ্চিন্ত হই।

"স্বামিজী বলেছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের সব জায়গাই হয়ত কালে মঠের অধীনে আসবে। মহাপুরুষদের আকাঙ্ক্ষা কখনও

কি মিথ্যা হয়? মথুরবাবু তো প্রাণ থেকে ঠাকুরকে সব দান করেই ছিলেন; কিন্তু ঠাকুর তখন উহা গ্রহণ করেন নি, এখন তাঁর কাজ কত দিকে কত ভাবে হচ্ছে—বিশেষ করে ঐ স্থানটী রক্ষা করার দরকার হয়ে পড়েছে। মায়ের ইচ্ছা যখন হবে তখন সবই দেখবে মঠের অধীনে আসবে।”

সন্ন্যাসী—“কিন্তু মহারাজ, এসব টাকাপয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করা বড় মুস্কিল ব্যাপার। তা ছাড়া আবার জমিদারী আছে—ঐ সবের রক্ষণাবেক্ষণ। বৈষয়িক ব্যাপার এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে জড়িত হবার দরুণ ক্রমে আদর্শচ্যুত হয়ে বড় বড় ধর্ম সম্প্রদায়ের পতন হয়ে গেছে—ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।”

মহাপুরুষজী—“তুমি যা বলছ তা একদিক থেকে ঠিকই। তবে আমার মনে হয় কি জান? যে সব ধর্মসঙ্ঘের পতন হয়েছে তার মূলে ছিল সাধনভজন ও ত্যাগতপস্যাদির অভাব। ঠাকুরের এ সঙ্ঘেও যতদিন ত্যাগবৈরাগ্য সমুজ্জ্বল থাকবে, সঙ্ঘের প্রত্যেক অঙ্গ যতদিন ভগবান লাভই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জেনে ভজনসাধন ও তপস্যাদিতে রত থাকবে, ততদিন কোনই ভয় নেই—সব ঠিক চলবে। সাধুর ঠিক ঠিক দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মহারাজ অতি চমৎকার একটী কথা বলতেন। তিনি বলতেন যে, সন্ন্যাসী যখন অট্টালিকায় বাস করবে তখনও ভাববে, ‘আমি গাছতলায় রয়েছি’; আর যখন চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাবে তখনও মনে মনে ভাববে, ‘আমি পবিত্র ভিক্ষান্ন খাচ্ছি’। তার মানে এই যে, সাধু সর্বাবস্থায় নির্লিপ্ত থেকে অন্তরে তপস্যার ভাব জাগিয়ে রাখবে। ভাব শুদ্ধ থাকলে আর কোন

ভয় নেই। ভাব নিয়েই সব। তা ছাড়া তোমরা যে সব কাজকর্ম করছ সে সবই তো শ্রীভগবানের কাজ—তোমাদের নিজের জন্য তো আর কেউ কিছু করছ না? কাজও তোমাদের সাধনের অঙ্গ। তাঁরই সেবাজ্ঞানে তাঁর কাজ করলে তাতে চিত্তের মালিন্য সব কেটে যাবে নিশ্চয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ভজনসাধন জোর চালাতে হবে। সাধনভজনে মন্দা পড়ে গেলে সবই গোলমাল। অনাসক্ত হয়ে করতে হবে তাঁর কাজ। এটা সর্বদা মনে রেখো যে, কেউ যদি আন্তরিক 'ঠাকুরের কাজ করছি' এই বুদ্ধিতে তাঁর কাজ করে যায় তার কখনই কোন অকল্যাণ হবে না, তিনি তাকে সতত রক্ষা করবেন। কিন্তু অহংকার, অভিমান এলেই মারা যাবে। ঠাকুর বলতেন—ভাবের ঘরে চুরি যেন না থাকে। 'তাঁর কাজ করে, তাঁর সেবা করে ধন্য হয়ে যাচ্ছি', এই ভাব আশ্রয় করে থাকলে কোন ভয় নেই। আর নিজের মনের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রতি কাজে নিজের মনকে বিশ্লেষণ করা চাই। যখনই লক্ষ্য করবে যে, মনের গতি এতটুকুও বদলেছে, তখনই তাঁর কাছে কাতর প্রার্থনা জানাবে, আর ভজনসাধনে আরও জোর দেবে। কাজ তো দিবারাত্রি সর্বক্ষণ করবে না? আর কাজের ভেতরও ঠিক চালাতে হবে তাঁর স্মরণমনন।"

সন্ন্যাসী—"জীবন্ত আদর্শ সামনে দেখতে না পেলে সব সময় জীবনের গতি আদর্শের দিকে নিয়ন্ত্রিত করা বড় মুস্কিল। এই আপনারা যতদিন আছেন ততদিন সবই ঠিক চলবে, তারপরে যে কি হবে তা ঠাকুরই জানেন!"

মহাপুরুষজী—"তা কেন? এইটে ঠিক জানবে যে, ঠাকুরই হলেন জীবন্ত আদর্শ। আর আমরাও তো আছিই। দেহের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই তো আর সব শেষ হয়ে যায় না? সাধন ভজনের দ্বারা মন সংস্কৃত হলে তখন সে মনে ভগবানের দিব্য জীবন্ত অনুভূতি হয়। সেই অনুভূতিই হল আসল অনুভূতি এবং তার প্রভাব সমগ্র জীবন ব্যাপী থাকে। তা ছাড়া তোমরাও কি কম? চোখের সামনে ঠাকুরের সন্তানদের আদর্শ-জীবন দেখতে পেলে, তাঁদের সঙ্গ লাভ করলে—এও বহু সুকৃতির ফলে হয়। তোমাদের কোন ভাবনা নেই। যাদের ভেতরে ঠিক ঠিক ত্যাগ বৈরাগ্য রয়েছে—তাদের কোন কালেই ভয় নেই। শ্রীভগবান তাদের হৃদয়ে প্রকটিত হবেন—দর্শন দিয়ে তাদের জীবন ধন্য করে দেবেন। আসল জিনিস হল ত্যাগ বৈরাগ্য—পবিত্রতা ও ভগবানলাভের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। এখন খুবই শুভ মুহূর্ত—এ সময় অল্প সাধনভজনেই জীবের চৈতন্য হবে। ঠাকুরের আগমনে ভগবানলাভের পথ অতি সুগম হয়ে গেছে। আর যে আধ্যাত্মিক স্রোত এসেছে তা বহু শত বৎসর চলবে—কোন সন্দেহ নেই। স্বামিজী তাঁর দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে এই উঠনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—যে স্রোত এসেছে তা অবাধে সাত আট শত বৎসর চলল্—কেউ তার গতি রোধ করতে পারবে না। এ যুগপ্রবাহ আপন শক্তিতে চলবে—কারো সাহায্যের অপেক্ষা করবে না। এসব ঐশী শক্তির ব্যাপার—মানুষ কি করবে? এ যুগপ্রয়োজন সাধনে যে সহায়ক হবে সে নিজে ধন্য

হয়ে যাবে। ঠাকুর যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে জগতে এসে-ছিলেন এবং যে শক্তিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছেন সেই ঐশী শক্তিকে অব্যাহত রাখবার জন্যই তো ঠাকুরের ইঙ্গিতে স্বামিজী এ ধর্মসঙ্ঘের গঠন করে গেছেন এবং এই মঠকে প্রধান কেন্দ্র করে ঐ কাজের সূচনা করেছেন। এই মঠই হল আধ্যাত্মিক শক্তির উৎপত্তি কেন্দ্র (power house); এখান থেকেই আধ্যাত্মিক শক্তির স্রোত বয়ে গিয়ে সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করবে। তাই তো তিনি নিজে মাথায় করে ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছিলেন। ঠাকুর স্বামিজীকে বলেছিলেন. 'তুই মাথায় করে নিয়ে গিয়ে আমায় যেখানে বসাবি আমি সেখানেই থাকব।' এ মঠ যে দিন প্রতিষ্ঠিত হল সে দিন স্বামিজী 'আত্মারাম'কে নিজে মাথায় করে নিয়ে এলেন এবং এ মঠে স্থাপন করলেন। পূজা, হোম, ভোগরাগ খুব হয়েছিল। আমি ঠাকুরের ভোগের পায়স রান্না করেছিলাম। ঠাকুরকে এ মঠে বসিয়ে স্বামিজী বলেছিলেন—'আজ আমার মাথা থেকে জীবনের সব চাইতে বড় দায়িত্ব নেমে গেল। এখন আমার শরীর গেলেও কোন ক্ষতি নেই।' তারপর থেকে এখানেই সব ভজনসাধন—আত্মারামকে কেন্দ্র করে। স্বামিজী, মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ এঁরা সকলে এখানে কত ভজনসাধন করেছিলেন। তাঁরা সকলেই অবতারকল্প মহাপুরুষ—ভগবানের পার্ষদ। অবতারের সঙ্গে ছাড়া এঁরা বড় একটা আসেন না। এত সব মহাপুরুষ এ মঠে কত ভজনসাধন করেছেন। ভেবে দেখ দেখি এ মঠ কি স্থান! স্বয়ং মা জগজ্জননী এখানে এসেছিলেন।

শুনেছিলাম যে, এ মঠ স্থাপনের পূর্বেই মা গঙ্গায় নৌকা করে যাবার সময় ঠাকুরকে এস্থানে দর্শন করেছিলেন। এ মঠ হবার পরেও অবশ্য আমরা পাহাড় জঙ্গলে তপস্যা করতে গিয়েছিলাম; কিন্তু আমাদের প্রাণ পড়ে থাকত মঠে আত্মা-রামের কাছে। এখন তো একে একে ঠাকুরের পার্ষদরা সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন—এবার তোমাদের পালা। ত্যাগ, তপস্যা ও ভজনসাধন দ্বারা এ মঠের আধ্যাত্মিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এমন আদর্শজীবন তৈরী করতে হবে যাতে লোকে তোমাদের সঙ্গ করে মনে করবে যে, সাক্ষাৎ ঠাকুরের এবং তাঁর পার্ষদদের সঙ্গ করছে। ঠাকুরের ভাব বলতে এক কথায় বুঝায়—ভগবান লাভই জীবনের উদ্দেশ্য আর ত্যাগ তপস্যা ও সর্বধর্মসমন্বয়ই প্রকৃত জীবন।"

জনৈক সন্ন্যাসী দক্ষিণ ভারতে এক শাখা কেন্দ্রে ঠাকুরের ভাব প্রচারের জন্য যাচ্ছেন। তিনি প্রণাম করে মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে বল্লেন—"মহারাজ, আশীর্বাদ করুন যাতে জীবনে ভগবান লাভ হয়। এতদিন আপনাদের কাছে কাছে ছিলাম, এখন আপনাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে সুদূর মান্দ্রাজে—সে জন্য মনে খুবই কষ্ট হচ্ছে! এখন তো আর ইচ্ছা করলেই আপনাদের দর্শন পাব না। এখন আপনারা ধ্যানের বস্তু। ওদেশে গিয়ে কি ভাবে থাকতে হবে তা একটু বলে দিন।"

মহাপুরুষজী সন্ন্যাসীটীকে খুবই আশীর্বাদ করে স্নেহভরে বল্লেন—"বাবা, তোমরা ঠকুরের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছ, তিনি সর্বদা তোমাদের রক্ষা করবেন। যেখানেই থাক এইটে ঠিক

মনে রেখো যে, ঠাকুর তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। তোমরা তাঁর পরম প্রিয়। তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, পবিত্র, তাঁকে লাভ করবে বলে সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছ, তিনি কি তা জানেন না? আহা! আমি এক এক সময় ভাবি, স্বামিজী যদি স্থূল শরীরে এখন থাকতেন তা হলে এ সব ছেলেদের দেখে কত না আনন্দ করতেন! তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানেও ঠাকুরের বহু ভক্ত আছে। যা দেখেছ, যা আমাদের কাছে শিখেছ তাই তাদের বলবে। আসল কথা হল ত্যাগ-তপস্যাপূর্ণ আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে হবে। ঠাকুরের জীবন ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্তি। তোমরা তাঁরই পবিত্র সঙ্ঘের সন্ন্যাসী—তাঁরই ভাব প্রচার করতে যাচ্ছ। সব চাইতে বড় প্রচার হল আদর্শ জীবন দেখানো—যাতে তোমাদের জীবন দেখে লোকে ঠাকুরকে ধরবার ও বুঝবার সুবিধে পায়। অতএব ঠাকুর-স্বামিজীর জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন যত গড়ে তুলতে পারবে ততই তোমাদের ভেতর দিয়ে তাঁদের ভাব বেশী প্রচার হবে। যখন নিজেকে দিশেহারা মনে করবে তখনই খুব কাতর প্রাণে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে—তিনি তো তোমার অন্তরাত্মা - ভেতরেই রয়েছেন। তিনি ভেতর থেকে আলো দেখাবেন—কি কর্তব্য তা ঠিক জানিয়ে দেবেন। তুমি যে কিছু প্রচার করতে যাচ্ছ এ ভাব কখনও মনে আসতে দিও না। ঠাকুর নিজেই তাঁর ভাব প্রচার করেন। তুমি আমি তাঁকে কি প্রচার করব? তাঁকে কে বুঝতে পারে? অনন্ত ''ভাবময় ঠাকুর—তাঁর কি 'ইতি' করা সম্ভব? অমন যে স্বামিজী

তিনিই বলেছেন—'ঠাকুর যে কি তা কিছুই বুঝতে পারলুম না', অন্যে পরে কা কথা। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিবিশ্বাস লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। তুমি এখানে যেমন ভজনসাধন, পড়াশুনা, সৎচর্চা এ সব করছিলে ওখানেও তাই করবে—বরং আরও বেশী করে করবে। তাতে তোমার নিজেরই কল্যাণ হবে। এখন তোমাদের সাধনভজন করার সময়—সে দিকেই জোর দেবে বেশী। আমি খুব প্রার্থনা করছি—ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতায় তোমার হৃদয় ভরে যাক—মানব জীবন ধন্য হোক।"

বেলুড় মঠ

১লা জানুয়ারী, ১৯২৪

আজ ১লা জানুয়ারী। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'কল্পতরু' উৎসব। মঠেও ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদির আয়োজন হয়েছে। ভোর হতেই ভক্তসমাগম শুরু হয়েছে: বিশেষতঃ ছুটির দিন বলে। তাঁরা ঠাকুর দর্শনাদি করে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে সমবেত হয়েছেন। তিনিও আনন্দে সকলের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ করছেন। জনৈক ভক্ত মহাপুরুষজীকে ভক্তিভরে প্রণামান্তর উপবেশন করে বল্লেন—"Happy New Year" (শুভ নববর্ষ)। মহাপুরুষজী হাসতে হাসতে বল্লেন—"Happy English New Year (শুভ ইংরাজী নববর্ষ)। আমাদের শুভ নববর্ষ তো ১লা বৈশাখ। আজ তো ইংরাজদের

শুভ নববর্ষ। এই দেখ না দেড় শত বৎসরের ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে আমাদের মনোবৃত্তি কি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও জাতিত্ব হারিয়ে ফেলতে বসেছি। আমরা শুধু পরাধীন জাত বলে যে এ অবস্থা হয়েছে তা নয়। পরাধীন তো আমরা অনেক কাল। মুসলমানরা আট নয় শত বৎসর অধীনে রেখেও আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি নষ্ট করতে পারে নি কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার এমনই সম্মোহিনী শক্তি, আর ওরা এমন কৌশলে তাদের ভাবধারা আমাদের ভেতর প্রচার করেছে যে, আমরা বুঝতেই পাচ্ছিনে, আমাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মবিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করাই তাদের উদ্দেশ্য! তার ফলে এত অল্পদিনের মধ্যেই অত বড় জাতটা খুব বেশী পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে সব বিষয়ে। ধীরে ধীরে আমাদের চিন্তাধারাও আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সব চাইতে বড় অনর্থ এই হয়েছে যে, সমগ্র হিন্দু জাতটা ক্রমে বৈদিক ধর্মে আস্থাশূন্য হয়ে পড়েছে। সনাতন হিন্দুধর্মে যা কিছু আছে সবই মিথ্যা ও কাল্পনিক আর খৃষ্টধর্মের ধ্বজাধারীরা যা বলছে সবই ধ্রুবসত্য—এই দাঁড়িয়েছে সাধারণের মনোবৃত্তি। ওদের মতলব ছিল ক্রমে সারা হিন্দুজাতটাকে খৃষ্টান করে ফেলবে; কিন্তু ভগবদিচ্ছায় তা হল না। এ সনাতন বৈদিক ধর্ম লোপ হয়ে গেলে যে সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিকতাই নষ্ট হয়ে যাবে—সে জন্যই তো এ সনাতন ধর্মকে রক্ষা করতে ভগবান অবতীর্ণ হলেন রামকৃষ্ণরূপে। আর ভগবানের যে সাকার উপাসনাকে খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজ পৌত্তলিকতা বলে

উপহাস করে আসছিল, তিনি তাঁর সাধনা শুরু করলেন সেই মূর্তিপূজা থেকে। তাঁর সব ভাবের সাধনা এবং সিদ্ধি সমগ্র জগৎকে চমৎকৃত করেছে—ফলে পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় মনীষীরাও ভারতীয় বৈদিক ধর্মের প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য অবনতমস্তকে স্বীকার করছেন; তার প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ অন্ধ অনুকরণপ্রিয় ভারতবাসীদেরও দৃষ্টি পড়েছে ঠাকুরের জীবনের উপর—এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ধর্মের উপর। ঠাকুরের আসার পর থেকেই দেশের হাওয়া বদলাতে শুরু করেছে। ভারতবাসী যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল সে আত্মবিশ্বাস ক্রমে ফিরে পেতে শুরু করেছে। ঠাকুরের অলৌকিক সাধনার ফলে ভারতের আত্মশক্তি জেগে উঠেছে। এখন দেখবে দিন দিন ভারতের অভূতপূর্ব উন্নতি হবে সব বিষয়ে। স্বামিজী বলেছেন যে ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ঐ মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে পড়েছিল; তাই হয়ে গিয়েছিল সব বিষয়ে হীনবল ও দুর্বলচেতা। ঠাকুর এসে সে মেরুদণ্ড আবার সুস্থ ও সবল করে দিয়েছেন; এখন ভারত খালি ধর্মে নয় সর্ব বিষয়ে সমগ্র জগৎকে তাক্ লাগিয়ে দেবে।

"যে শক্তির প্রভাবে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ঠাকুর সেই ব্রহ্মশক্তিকে জাগরিত করেছেন। তিনি যে কি করে গেছেন জগতের জন্য—ক্রমে তা বুঝবে জগতের লোক। আহা! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ঐ সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপের সঙ্গে ছিলাম—তাঁর দর্শন স্পর্শন ও সেবাদি করতে পেরেছিলাম! তাঁর স্পর্শে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে! তাঁকে দর্শন করবার সৌভাগ্য যাদের হয় নি অথচ তাঁর ভাব আশ্রয় করে নিজেদের জীবন

গঠন করছে—তাঁকেই জীবনের আদর্শ করেছে—তারাও ধন্য হয়ে যাবে। সর্ব ভাবময় প্রভু—তিনি ত্রিলোকেশ্বর, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, বাঞ্ছাকল্পতরু। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এ চতুর্বর্গের যে যা প্রার্থনা করবে তাঁর কাছে আন্তরিক ভাবে, তিনি তাকে তাই দেবেন। তাঁর কথা আর কি বলব ?"

ভক্ত—"আজকের দিনে তো তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন—কত ভক্তদের কৃপা করেছিলেন।"

মহাপুরুষজী—"কেবলমাত্র আজকের দিনে তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন - তা কেন ? তিনি তো সদাই কল্পতরু। জীবকে কৃপা করাই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল। আমরা তো চোখের সামনে দেখেছি, তিনি নিত্যই কত জীবকে কত ভাবে কৃপা করতেন। হাঁ, কাশীপুরের বাগানে এই দিনে তিনি একসঙ্গে অনেক ভক্তকে কৃপা করেছিলেন। সে হিসাবে আজকের দিনের একটা বিশেষত্ব আছে। তিনি যে কৃপাসিন্ধু ছিলেন - তা সে দিনকার ঘটনায় ভক্তরা বিশেষ করে বুঝতে পেরেছিলেন।"

ভক্ত—"মহারাজ, আপনি সে দিন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি ?"

মহাপুরুষজী—"না। আমি কেন ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে কেউই সে সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন না। ঠাকুরের তখন কঠিন অসুখ—আর আমাদের প্রাণে তখন তীব্র বৈরাগ্য। ঠাকুরের শরীর এমনই অসুস্থ ছিল যে, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর সেবার জন্য আমরা পালা করে থাকতাম। ভক্তেরা সকলে দিনের বেলায় সময় সুবিধা মত আসতেন, ঔষধ পথ্যাদি ও

খরচপত্রের সব ব্যবস্থা করতেন; কিন্তু তাঁর সেবার সম্পূর্ণ ভারই আমরা নিয়েছিলাম। আর তাঁর সেবার সঙ্গে চলেছিল খুব সাধন-ভজন। ঠাকুরও সে বিষয়ে আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেককে ডেকে ভজনসাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং কার কেমন ধ্যান ও দর্শনাদি হচ্ছে সে সব খোঁজ নিতেন। রাত্রে স্বামিজী ধুনি জ্বালিয়ে আমাদের নিয়ে ধ্যানজপ করতেন—কখনও খুব ভজনকীর্তনও হত। পালা করে ঠাকুরের সেবা আর ধ্যানজপাদিতে সারারাত খুবই আনন্দে কেটে যেত। রাত জাগা হত বলে দুপুর বেলা খাওয়ার পরে আমরা প্রায় সকলেই খানিক-ক্ষণ ঘুমিয়ে নিতুম। সেদিনও খাওয়া দাওয়ার পরে, নীচের হল ঘরের পাশে যে একটী ছোট ঘর ছিল সে ঘরে আমরা ঘুমুচ্ছিলাম। সে দিনই বিকেল বেলা ঠাকুর একটু বাগান বেড়াবার জন্য প্রথম নীচে নামেন। ছুটির দিন বলে অনেক ভক্তই সে সময় বাগানে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরকে নীচে নামতে দেখে ভক্তেরাও আনন্দে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঠাকুর বাগানের ফটকের দিকে যাচ্ছিলেন—এমন সময় গিরীশ বাবু ঠাকুরের চরণতলে পতিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে করযোড়ে তাঁকে স্তব করতে লাগলেন। গিরীশবাবুর অদ্ভুত ভক্তিবিশ্বাসের কথা শুনতে শুনতে ঠাকুর দাঁড়িয়েই সমাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। ভক্তেরা তখন ঠাকুরের ঐ দিব্য ভাবাবেশ দেখে আনন্দে 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলে চিৎকার করে ঠাকুরকে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন। ক্রমে ঠাকুরের মন অর্ধবাহ্য দশায় নেমে এল। তখন তিনি কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তদের দিকে

তাকিয়ে বল্লেন—'কি আর বলব! তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তদের প্রাণে এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। তাঁরা খুব 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি করতে লাগলেন—আর ঠাকুরকে প্রণাম করতে লাগলেন। তিনিও ঐ অবস্থায় একে একে প্রায় সকলকেই 'চৈতন্য হোক' বলে স্পর্শ করে সকলের চৈতন্য করে দিলেন। তাঁর ঐ দিব্যস্পর্শে ভক্তদের প্রত্যেকের ভেতরই অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগল। তখন কেউ বা ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন, কেউ আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন, কেউ কাঁদতে লাগলেন, আবার কেউ বা উন্মত্তের ন্যায় জয়ধ্বনি করতে লাগলেন। সে এক অভাবনীয় ব্যাপার! আর ঠাকুর দাঁড়িয়ে আনন্দে সে সব দেখছিলেন। ঐ গোলমালে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমরা ছুটে এসে দেখি যে, ভক্তেরা সকলে ঠাকুরকে ঘিরে উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করছেন; আর তিনি মধুর হাসিমুখে সস্নেহে ভক্তদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমরা যখন এসে পৌঁছি তখন ঠাকুরের মন সহজাবস্থায় ফিরে এসেছে; কিন্তু ভক্তেরা তখনও সেই আনন্দের নেশায় মশগুল। পরে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করে সব ব্যাপার জানা গেল। সকলেই বলেছিলেন যে, ঠাকুরের স্পর্শে তাঁদের অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছিল এবং সে ভাবের প্রভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। তাঁর স্পর্শে হবে না তো কি? তিনি যে স্বয়ং ভগবান। সে দিনও কিন্তু ঠাকুর দু' একজনকে স্পর্শ করেন নি। বলেছিলেন—'এখন নয় পরে হবে।' তাতেই বেশ বোঝা যায়

যে, সময় না হলে কিছুই হয় না। সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।”

ভক্ত—“তিনি তো মহারাজ, ইচ্ছামাত্রই জীবের মন ভগবন্মুখী করে দিতে পারেন, হৃদয় পবিত্র করে দিতে পারেন; তা করেন না কেন? তাঁর কৃপা যদি সাধনভজন সাপেক্ষ হল—তা হলে তিনি অহেতুক কৃপা-সিন্ধু কি করে হলেন?”

মহাপুরুষজী—“হাঁ, তুমি যা বলছ তা ঠিকই। অমনি বলতে হয়—তাই বলা। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি ভজন-সাধন দ্বারা লভ্য নন। আবার তিনি যে ‘লভ্য’ একথাও বলা চলে না, কারণ প্রত্যেক জীবের স্বরূপই তিনি—তিনি সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা। যে সব আবরণের দ্বারা জীবের অন্তর্দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে থাকে ভজনসাধন সেই সব আবরণগুলি দূর করে মাত্র। তখন জীব স্ব-স্বরূপকে জানতে পারে—অন্তরাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। তিনি কৃপা করে জীবকে অজ্ঞান-আবরণ থেকে মুক্ত করে দিচ্ছেন বলেই তো জীবের প্রাণে তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষা হয়—এই তাঁর কৃপা। তবে সবই নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুসারে হয়ে থাকে। যেমন একটী শিশুকে নিমেষ মধ্যে বড় করে দেওয়াটা অস্বাভাবিক ও নেহাৎ জোর করে করার প্রচেষ্টা মাত্র—এও ঠিক তেমনি। দেহমনের ক্রমবিকাশ হতে হতে শিশু ক্রমে বালকত্ব, যুবত্ব, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে উপনীত হয়; তেমনি জীবের মনে ভগবদ্ভাব স্ফুরণেরও স্তর আছে, ক্রম আছে। সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যে বিকাশ হয় তাই ঠিক এবং তারই ফল ভাল হয়। অবশ্য, শ্রীভগবান ইচ্ছা

মাত্র এক দিনে সব জীবকে মুক্ত করে দিতে পারেন, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান; কিন্তু তিনি তা করেন না। একই নিয়মে তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন; নিয়মের ব্যতিক্রম বড় একটা হতে দেন না বিশেষ কারণ না হলে। তিনি অহেতুক কৃপা-সিন্ধুও বটেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁর সৃষ্ট জীবদের প্রতি তাঁর যে কত কৃপা, কত দয়া, তা যদি একটুও জানতে পারতে তা হলে তিনি কৃপাসিন্ধু কি না এ প্রশ্নও মনে স্থান পেত না। এই যে জীব-দুঃখে কাতর হয়ে জীব উদ্ধারের জন্য স্থূল দেহ ধারণ করে জগতে অবতীর্ণ হন—এই তো সব চাইতে বড় প্রমাণ যে, তিনি কৃপাসিন্ধু। তিনি তো সদা পূর্ণ, তাঁর পাবার বা চাওয়ার কিছু নেই। অথচ তিনি কৃপা-পরবশ হয়ে জীবোদ্ধাররূপ কর্মে প্রবৃত্ত হন। তাঁর প্রাণে একমাত্র বৃত্তি আছে, তা হল কৃপা—প্রেম। তিনি যে কত কৃপাময় তা কি বলে বোঝান যায়? ও হল অনুভবের জিনিস। মানুষ খেলায় মত্ত—তাঁর কৃপা জানতে চাচ্ছে কোথায়? ঠাকুর বলতেন—'জীব ভগবানের দিকে এক পা এগুবার চেষ্টা করলে ভগবান তার দিকে দশ পা এগিয়ে আসেন।' এত তাঁর দয়া! তাঁর কৃপায় সন্দেহ করো না—ও ভাব মনে আসতেও দিও না। তাঁকে ডেকে যাও প্রেমের সহিত; তাঁর কৃপায় প্রাণ-মন ভরে যাবে। ও সব উপলব্ধি কি এক দিনে হয়—না হঠাৎ হয়? ক্রমে সব হবে, সব পাবে। আমরাও ঠাকুরকে না দেখলে কি ঠিক ঠিক বুঝতে পারতাম যে, ভগবানের কত কৃপা জীবের উপর? তিনি কৃপা করবার জন্য ছটফট করতেন

—কাঁদতেন। তাঁর কৃপা আন্তরিক ভাবে চায় কে? মানুষ তো মত্ত হয়ে আছে বৈষয়িক আনন্দে। ভগবদ্ আনন্দ যে চায় সে পায়ও।"

দেওঘর

১৯২৬

বিদ্যাপীঠের নূতন জমিতে গৃহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহাপুরুষ মহারাজ বেলুড় মঠ হতে অনেক সাধুব্রহ্মচারী সহ দেওঘরে আসেন। তাঁর শুভাগমনে তথায় নিত্য আনন্দোৎসব চলেছিল। মহাপুরুষজীর পূত সঙ্গে সকলেই প্রাণে এক আধ্যাত্মিক প্রেরণা অনুভব করে ধন্য হয়েছিল। তিনিও ঐ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে খুবই আনন্দে ছিলেন। একদিন অনেক সাধুব্রহ্মচারী তাঁর নিকট সমবেত হয়েছেন এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন—"মহারাজ, আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত কিছু বলুন, শুনতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে।' মহাপুরুষজী স্মিতমুখে বল্লেন—"সে সব পুরাণো খবর শুনে আর কি হবে? সে এক সময় খুব করা গেছে; এখন তো ঠাকুর আমাদের এ কর্ম-বৃত্তান্তে টেনে এনেছেন। তাঁর যুগধর্ম প্রচারের জন্য এরূপই প্রয়োজন হয়েছে। তাই এখন এ বুড়ো বয়সে আমাদের দ্বারাও ঠাকুর তাঁর কাজ কিছু কিছু করিয়ে নিচ্ছেন। আমরা তো ভেবেছিলাম যে, তপস্যা করে জীবন কাটিয়ে দেব—করছিলামও তাই; কিন্তু ঠাকুর তা করতে দিলেন কোথায়? দেখ না, খেটে খেটে স্বামিজীরই

কত অল্প বয়সে শরীর চলে গেল। তিনি তো হিমালয়ে তপস্যা করতে কতবার গিয়েছিলেন; কিন্তু কে যেন তাঁকে টেনে হিমালয়ের ক্রোড় থেকে নামিয়ে নিয়ে এল। তার পর তিনি রাজপুতানা প্রভৃতি নানা স্থানে ঘুরতে লাগলেন. কত রাজা মহারাজার সঙ্গে তাঁর কাজ ছিল। ঘুরতে ঘুরতে পোরবন্দরে এলেন; তখন সেই ষ্টেটের রাজা ছিল না—নানারকম অব্যবস্থা চলেছিল। সে জন্য গভর্ণমেণ্ট হরিশঙ্কর রাওকে administrator (কার্য নির্বাহক) করেছিলেন। হরিশঙ্কর রাও খুবই বিদ্বান. বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও অতি সৎ লোক ছিলেন। ইউরোপের নানা স্থান ঘুরেছিলেন এবং ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি ভাষাও বেশ শিখেছিলেন। তাঁর বাড়িতে তাঁর নিজের খুব প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল; নিজেও খুব পড়াশুনা করতেন। তাঁর পুস্তকালয় দেখে স্বামিজীর ভারী লোভ হল। কথায় কথায় হরিশঙ্কর বাবুকে ইচ্ছা জানাতে তিনি খুবই খুসী হয়ে বল্লেন—'আপনার যত দিন ইচ্ছে এখানে থেকে পড়ুন।' তখন স্বামিজী কিছুদিন ওখানে থেকে গেলেন। হরিশঙ্কর বাবু বেশ ভাল সংস্কৃত জানতেন। এক দিন তিনি স্বামিজীকে বলেন—'দেখুন স্বামিজী, আগে শাস্ত্রাদি পড়ে মনে হ'ত যে, শাস্ত্রগুলির ভেতর যেন সত্য নেই, ওগুলো সব শাস্ত্রকারদের মাথার খেয়াল—যার যা ইচ্ছে তাই লিখে গেছেন। কিন্তু এখন আপনাকে দেখে ও আপনার সঙ্গ করে আমার সে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে; এখন মনে হচ্ছে যে, আমাদের ধর্মগ্রন্থাদি সবই ঠিক। আমি পাশ্চাত্য দেশে দেখেছি যে, ওদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমাদের হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্রাদির

সম্বন্ধে জানবার জন্য বিশেষ উৎসুক। কিন্তু এমন লোক তারা এখনও পায় নি যিনি তাঁদের নিকট এ সব শাস্ত্রাদি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। আপনি যদি ওদেশে গিয়ে আমাদের বৈদিক ধর্ম তাদের নিকট ব্যাখ্যা করেন তো খুব বড় কাজ হয়।' এই দেখ, কি ভাবে তাঁর কাজের সূচনা হয়। তা শুনে স্বামিজী বল্লেন—'তা বেশ তো! আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কাছে এদেশ ওদেশ কি? দরকার হলে যাব।' তখন হরিশঙ্কর বাবু বল্লেন—'ওদেশে অভিজাত সম্প্রদায়ে মিশতে হলে ফরাসী ভাষা শেখা দরকার: আপনি ফরাসী শিখুন—আমি আপনাকে ফরাসী শেখাব।' তখন তিনি বেশ ফরাসী শিখে ফেললেন। আমি তখন আলমবাজার মঠে রয়েছি। স্বামিজী তার পূর্বে প্রায় দু বৎসর যাবৎ নিরুদ্দেশ। তিনি যে কোথায় আছেন তা কেউ জানত না—আলমবাজার মঠ দেখেও জান নি। হঠাৎ এক দিন মস্ত চার পাতা এক চিঠি এসে হাজির। কি ভাষায় যে ও চিঠি লেখা তা আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। শশী মহারাজ ও সারদা সামান্য ফরাসী জানত। তারা অনেক দেখে বললে, 'এ তো নরেনের চিঠি বলে মনে হচ্ছে—ফরাসী ভাষায় লেখা।' তখন ঐ চিঠি নিয়ে কল্‌কাতায় অঘোর চাটুয্যের কাছে যাওয়া হল। তিনি হায়দরাবাদ ষ্টেট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন—বেশ ভাল ফরাসী জানতেন। তিনি ঐ চিঠি পড়ে আমাদের বাংলা করে বুঝিয়ে দিলেন। তখন স্বামিজীর খবরও পাওয়া গেল, আর জানা গেল যে, তিনি ফরাসী ভাষা শিখেছেন।

হাঁ, আগে বলেছিলাম যে স্বামিজী ধ্যানজপ ও তপস্যাদিতে জীবন কাটিয়ে দেবার মতলব করেছিলেন; কিন্তু যে মহাশক্তি রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি তাঁকে তা করতে দিলেন না—জগতের উদ্ধারের জন্য যুগধর্ম প্রচাররূপ কার্যে নিয়োজিত করলেন। তিনি তো যোগিরাজ ইচ্ছা করলেই সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারতেন; কিন্তু ঠাকুর তাঁকে তীব্র কর্মের ভেতর টেনে ফেলে দিলেন। তোমাদের সকলকেও তিনি তাঁর যুগধর্ম প্রতিষ্ঠার সহায়করূপে নিয়োজিত করেছেন। যাকে তিনি ডেকেছেন সেই ধন্য।"

জনৈক সন্ন্যাসী—"তপস্যা এবং সাধন ভজনেরও তো প্রয়োজন আছে? আপনারা কত করেছেন!"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, ভজনসাধনের খুবই দরকার—তপস্যাও চাই। জীবনের গতি ভগবন্মুখী করে রাখবার একমাত্র উপায় ভজনসাধন, কিন্তু সে ভজনসাধন ও তপস্যা কি শুধু এক রকমই? এই যে তোমরা কত কষ্ট সহ্য করে, কত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে ভগবানের কাজ কচ্ছ, এও এক রকমের তপস্যা। সবক্ষণ প্রাণে এই ভাব জাগিয়ে রাখতে হবে যে, যা সব কাজ করছ সবই তাঁর কাজ, তাঁরই সেবা—তোমাদের কিছুই নয়। এও এক রকমের সাধনা। তিনি কৃপা করে তোমাদের তাঁর কাজের যন্ত্রস্বরূপ করেছেন। তাতে তোমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে। এটা ঠিক জানবে যে, তাঁর যুগধর্ম সংস্থাপনের কাজ কোন ব্যক্তি-বিশেষের জন্য আটকায় না। যার ভাগ্য ভাল সেই তাঁর কাজ করতে পারে। কত লোক দেখেছি বেশ গুণ আছে; কিন্তু ঠাকুর তাদের গ্রহণ করেন না। আবার কেউ কেউ বাহ্যিক দৃষ্টিতে

দেখলে মনে হয় অকর্মণ্য, কিছু নয়; অথচ ঠাকুর তাদের দিয়ে আশ্চর্যরূপে কত কাজ করিয়ে নেন। যে তাঁর কাজ করবার সুযোগ পায় সেই ধন্য হয়ে যায়। তাই তো স্বামিজী বলতেন যে, তিনি ইচ্ছামাত্র লাখ বিবেকানন্দ তৈরী করে নিতে পারেন। এ ভাব সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে যে, তাঁর কাজ করে আমাদের জীবন সার্থক হয়ে গেল। ভগবানের কাজ করতে কর্মীদের ভক্তি, বিশ্বাস ক্রমে হবেই হবে—নিশ্চয় জেনো। যারা পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মাধুকরী করে সাধন ভজন করছে, তাদের তপস্যার চাইতে তোমরা যা করছ এও কোন অংশে কম নয়। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই যুগধর্ম।"

জনৈক সন্ন্যাসী -"কাজকর্ম করতে করতে মাঝে মাঝে খুব অহংকার অভিমান ইত্যাদি এসে পড়ে।"

মহাপুরুষজী—"যতক্ষণ ভগবানের কাজ করছ এ বুদ্ধি ঠিক থাকবে, ততক্ষণ অহংকার ইত্যাদি আসতে পারে না। ভাব ঠিক থাকলে কোন ভয় নেই। কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ধ্যানজপটাও রাখা চাই—ওতে সাম্যভাব ঠিক রেখে দেয়। একটু আধটু অহংকার অভিমান এলেও তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি নেই- তিনি আবার ঘটনাচক্রে ফেলে ও সব দূর করে দেবেন। অহংকার অভিমানের কথা যা বলছ তা যারা তপস্যা করতে যাচ্ছে, তাদেরও তো এই অভিমান এসে যেতে পারে যে, আমি মস্তবড় তপস্বী হয়েছি। আসল কথা কি জান? ভাব শুদ্ধ হওয়া চাই। 'ভাবের ঘরে চুরি' থাকলে ঠিক ঠিক তপস্যাও হবে না, ঠিক ঠিক কাজও হবে না। মন মুখ এক রেখে কাজই কর, আর তপস্যাই কর, কোন অবস্থাতেই

অহংকার, অভিমান আসতে পারে না। উদ্দেশ্যের দিকে সর্বক্ষণ নজর রাখতে হয়—জীবনের লক্ষ্য যাতে ভুল না হয়।”

উতকামণ্ড

১৯২৬

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ মান্দ্রাজ হতে ৪ঠা জুন নীলগিরি পর্বতে আসেন এবং তথায় দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থ বালাজীর (বা তিরুপতির) মোহন্ত মহারাজের গ্রীষ্ম-নিবাস শ্রীহাতিরামজী মঠ নামক বাড়িতে অবস্থান করেন। উতকামণ্ডের আবহাওয়া অতি সুন্দর এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যও বড়ই মনোরম। উচ্চতা সমুদ্র হতে প্রায় আট হাজার ফুট। ওখানে মান্দ্রাজ গভর্ণরের গ্রীষ্মনিবাস আছে। ১৯২৪ সালের মে মাসের প্রথম ভাগে মহাপুরুষজী আর একবার নীলগিরি পর্বতে এসেছিলেন এবং উতকামণ্ড হতে দশ বার মাইল নীচে কুন্নুর নামক স্থানে কয়েক মাস ছিলেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি উতকামণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

উতকামণ্ডে আসা অবধি মহাপুরুষজী অধিকাংশ সময়ই একাকী নিজের ভাবে থাকেন—লোকজনের সঙ্গ বড় একটা পছন্দ করেন না। অবশ্য স্থানীয় ভক্তগণ নিত্যই অপরাহ্ণে তাঁর নিকট আগমন করেন এবং নানাবিধ ধর্মপ্রসঙ্গাদি শ্রবণ ও তাঁর পূত আশীর্বাদ গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত প্রাণে ফিরে যান। তাঁর ভগবদ্‌ভাবে আকৃষ্ট হয়ে ভক্তসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভক্তসঙ্গ ছাড়া অন্য সময় তিনি আত্মারাম হয়ে যেন ‘চিদানন্দ সিন্দুনীরে’ ডুবে থাকেন। বহির্জগৎ থেকে মন দিন

দিনই উঠে যাচ্ছিল এবং ক্রমেই তিনি বেশী গম্ভীর ও অন্তর্মুখ হয়ে পড়ছিলেন। সাধারণভাবে কথাবার্তা বা মেলামেশা যা হত তা কেবল সরলমতি পাহাড়ী বালক বালিকাদের সঙ্গে। রোজ সকাল সন্ধ্যায় যখন একাকী বেড়াতে যেতেন তখন তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন কিছু পয়সা ও খাবার। পথে পথে সেই পয়সা এবং খাবার বিলাতেন ছোট ছোট পাহাড়ী বালক বালিকাদের মধ্যে, আর তাদের সঙ্গে এমন সরলভাবে মিশতেন যেন তারা তাঁর সমবয়সী।

শ্রীহাতিরামজী মঠে নিজ প্রকোষ্ঠে যখন তিনি একাকী বসে থাকতেন তখন অধিকাংশ সময়ই মুদ্রিত নয়ন অথবা ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি, যেন কোন্ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে তাঁর মন ভেসে বেড়াচ্ছে। সে সময় তাঁর নিকট যেতে ভয় হত। সমগ্র মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঐ নীলগিরি পর্বতের গভীর নীরবতার মধ্যে জীবনের বাকী কটা দিন কাটিয়ে দেবেন, তাও কখনও কখনও বলতেন। কোন কিছুতেই যেন আঁট নেই, সর্ব ব্যাপারেই নির্লিপ্তভাব।

একদিন সকালে বেড়িয়ে এসে তিনি নিজ প্রকোষ্ঠে চুপচাপ বসে আছেন কাঁচ ঘেরা প্রকাণ্ড জানালার দিকে মুখ করে—ঢেউ খেলান নীল পর্ব্বতমালার উপর যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ। জনৈক সেবক ঘরে ঢুকেই তাঁকে অত্যন্ত উদাসভাবে বসে থাকতে দেখে শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার শরীর ভাল আছে তো মহারাজ?" মনে হল, সেবকের প্রশ্নে তাঁর চিন্তাধারা বাধাপ্রাপ্ত হলেও প্রশ্নটি তাঁর কানে পৌছায় নি। তিনি তৎকালীন নিজ চিন্তাধারাই ভাষায় কথঞ্চিৎ প্রকাশ করে বল্লেন—"দেখ, এস্থানের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া অতি চমৎকার। মন স্বতঃই অসীমের দিকে ছুটে যায়। এখানে

যে এত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব আছে তা আমার ধারণাই ছিল না। এখন যত দিন যাচ্ছে ততই সব আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি; আর ভাবছি ঠাকুরের দয়ার কথা। তিনি কৃপা করে এ সব দিব্য অনুভূতির আনন্দ দেবেন বলেই বোধ হয় আমায় এখানে এনেছেন। বহু বৎসর পূর্বে হিমালয়ে যখন ছিলাম তখন ঠিক এমনটি অনুভব হত। মনের সহজ গতিই ধ্যানের দিকে। আপনা হতেই মন স্থির ও শান্ত হয়ে আসে। জোর করে মনকে নামিয়ে আনতে হয়। এখানে প্রাচীনকালে নিশ্চয়ই অনেক মুনি ঋষি কঠোর তপস্যা করেছিলেন; তাই এখনও এমন একটা জমাট-বাধা ভাব রয়েছে। এ স্থান তপস্যার খুবই অনুকূল। সেদিন চি— ওরা বলছিল যে, এখানকার জঙ্গলে নানাপ্রকার ফল রয়েছে। ঋষিরা বোধ হয় ঐ সব ফলমূল খেয়ে এখানে তপস্যা করতেন।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় বল্লেন—"সেদিন এমনি করে ঐ নীল পাহাড়ের সারির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছি; দেখি যে, এ শরীর থেকে একজন বেরিয়ে এসে ক্রমে সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়ে গেল।" এই মাত্র বলেই তিনি একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—"ঠাকুরই আমার পরমাত্মা, তিনিই এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন—'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।'"

নীরবে খানিকক্ষণ মুগ্ধভাবে অপেক্ষা করে সেবক করযোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমাদের কি এ সব অনুভূতি কিছু হবে না, মহারাজ? এখানকার আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার যে কি বিশেষত্ব আছে, তাতো মহারাজ মোটেই বুঝতে পারিনে।"

"মহাপুরুষজী—দেখ বাবা, অনুভূতি করিয়ে দেবার একমাত্র মালিক তিনি। তাঁকে ধরে থাক, তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর, যখন যা দরকার তিনিই কৃপা করে সব দেবেন। মনের প্রভু তো তিনিই—সেই পরমাত্মারূপী ঠাকুর। তিনি দয়া করে মনের একটু মোড় ফিরিয়ে দিলেই মত্ত করী সদৃশ অশান্ত মনও শান্ত এবং সমাধিস্থ হয়ে যায়—একেবারে নির্বিষয় হয়ে যায়। মন খুব সূক্ষ্ম না হলে আধ্যাত্মিক ভাবের কি করে অনুভব হবে? আর এক দিনেই কি মন নির্বিষয় হয়? কত সাধনভজন দরকার! মন যখন খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে যায় এবং একটা উচ্চ ভূমিতে থাকে তখনই ঐ সকল সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুভূতি হওয়া সম্ভব। মন শুদ্ধ হলেই সেই মনে আধ্যাত্মিক ভাব স্পন্দিত হবে। মন যতই উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হবে ততই সেই মনে উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিকভাব প্রতিফলিত হবে। সার কথা হল—তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিবিশ্বাস লাভ করা, তা হলেই সব হল।"

উতকামণ্ডে মহাপুরুষজীর শুভাগমনের সংবাদ চারদিকে প্রচারিত হতেই মান্দ্রাজ প্রদেশের নানা স্থান হতে অনেক ভক্ত তাঁর পূত সঙ্গ ও কৃপালাভ মানসে ওখানে উপস্থিত হচ্ছিলেন। সকলেই নূতন আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও আলোক পেয়ে পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরে যাচ্ছিলেন। মালাবার হতে যে কয়েকদল ভক্ত মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাকণা লাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন মহাপুরুষজীর নিকট হতে বিদায় আশীষ ভিক্ষা করে বলেছিলেন—"ঠাকুরকে দর্শন করার সৌভাগ্য তো আমার হয় নি, আপনিই আমার নিকট ঠাকুর—আপনিই আমার পরমগতি।" মহাপুরুষজী তা শুনে সস্নেহে বল্লেন

—"অমন কথা বলতে আছে ? সকলেরই পরমগতি তিনি—সেই প্রভু। ঠাকুরের কথায় পড়েছো তো ? তিনি বলতেন—সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিছু সমুদ্র নয়। আমি তাঁর চরণাশ্রিত দাস মাত্র। গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানই সকলের একমাত্র গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, আশ্রয়, রক্ষক ও সুহৃৎ, তিনি সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্তা, সকলের আধার এবং সংসারের অব্যয় মূল। সবই সেই ভগবান্। তোমার পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় পেয়েছ। আর তাঁর একজন নগণ্য ভৃত্য তোমাকে তাঁর শ্রীচরণে উৎসর্গ করে দিয়েছে। ভগবচ্চরণে উৎসর্গীকৃত নবজীবন লাভে তুমি ধন্য হয়ে গেছ। আচার্য শঙ্কর বলেছেন—

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥

তিনটী জিনিস বাস্তবিকই দুর্লভ, ভগবানের কৃপাতেই তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—মনুষ্যজন্ম, মুক্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং মহাপুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ গুরুর আশ্রয় লাভ। দৈবকৃপায় তুমি এই তিন দুর্লভ সম্পদেরই অধিকারী হয়েছ; এখন ডুবে যাও তাঁর প্রেমের সাগরে, অমর হয়ে যাবে। বৈষ্ণব গ্রন্থে একটি অতি সুন্দর কথা আছে—'গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল। একের দয়া বিনে জীব

ছারে খারে গেল॥' ভগবানের কৃপা হ'ল, গুরুকৃপা হল, আর বৈষ্ণব মানে যিনি বিষ্ণুকে জেনেছেন তাদৃশ পরম ভক্তের কৃপাও হল; কিন্তু একের দয়া অর্থাৎ নিজের চেষ্টার অভাবে সবই বৃথা হল—জীব মুক্ত হতে পারলে না। তোমার জীবনেও সব রকম যোগাযোগ হয়েছে। এখন যা পেয়েছ তা নিয়ে সাধনভজনে ডুবে যাও। অমৃতত্ব লাভ কর—অমর হয়ে যাও। এই জন্মমৃত্যুর প্রহেলিকায় আর পড়তে হবে না।"

ভক্ত—"আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে সাধনভজনে ডুবে যেতে পারি, আর এ সংসারজালে যেন বদ্ধ না হই।"

মহাপুরুষজী - "আশীর্বাদ করছি বলেই তো তোমায় এত বলছি। প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি—তোমার সমগ্র মন-প্রাণ শ্রীগুরুমহারাজের চরণধ্যানে মগ্ন হয়ে যাক্। আমাদের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নেই, বাবা। কেউ ভগবান লাভ করতে চায়, এমন কি সেদিকে একটুবার চেষ্টা করছে দেখলেও আমাদের প্রাণে যে কত আনন্দ হয় তা আর কি বলব? যারা ভববন্ধন হতে মুক্ত হতে চায় এবং সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে তারা আমাদের পরম প্রিয়। ঠাকুর এসেছিলেন জীবকে মুক্তি দেবার জন্য। আমরাও তাঁর চরণাশ্রিত দাস, যুগে যুগে তাঁরই ভৃত্য। জীবকে ভগবন্মুখী করা, তাঁর দিকে একটুবার সাহায্য করা, এই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। সে জন্যই ঠাকুর আমাদের সঙ্গে করে এনেছেন এবং এখনও জগতে রেখেছেন। জীবনের

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরাও লোককে তাই শেখাব—কি করে ভগবান্ লাভ হয়।

এ সংসার অনিত্য, দুদিনকার। কী বিড়ম্বনা! অথচ এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন নিয়ে, অনিত্য সংসারের ক্ষণিক সুখে মত্ত হয়ে মানুষ জীবনের লক্ষ্য একেবারে ভুলে থাকে! এমনই ভুবনমোহিনী মায়ার খেলা! দেখ বাবা, তুমি এখনও যুবক, তোমার মনে প্রভুর কৃপায় সংসারের ছাপ এখনও পড়ে নি। তোমায় সারকথা বলছি, যা আমাদের প্রাণের কথা। ত্যাগ ছাড়া কিছুই হবে না। তাই তো উপনিষদ্ বলছে—'ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ।' একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। যোগ আর ভোগ একসঙ্গে হয় না। সংসারের ভোগসুখ না ছাড়লে সেই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাওয়া অসম্ভব। আর এই সংসার যে কি তা ঠাকুর খুব সরল কথায় বলে গেছেন—কামিনী আর কাঞ্চন এই হল সংসার। শুধু বাহ্যিক ত্যাগ করলে হবে না; মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ভোগের আসক্তিও ত্যাগ করতে হবে। তুলসীদাসও বলেছেন—'জহাঁ কাম তহাঁ নহী রাম।'—যেখানে কাম সেখানে রাম নেই, অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করতে হলে জাগতিক সব ভোগ-বাসনা ছাড়তে হবে।"

বোম্বাই

বুধবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯২৭

স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আজ আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের পঞ্চষষ্ঠীতম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। পূজাপাঠ, ভজনকীর্তন, ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণের সেবাদি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের উপস্থিতিতে উৎসবের আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হয়েছিল।

সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা মহাপুরুষজীর ঘরে সমবেত হয়ে তাঁর নিকট স্বামিজীর প্রসঙ্গ শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনিও স্বামিজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন হতে আরম্ভ করে একসঙ্গে কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের সেবা ও পরে বরাহনগরে মঠস্থাপনাদি ঘটনা সংক্ষেপে বলার পরে জনৈক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন—"মহারাজ, পরিব্রাজক অবস্থায় আপনি এবং স্বামিজী কখনও একসঙ্গে ছিলেন কি?"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, কখনও কখনও স্বামিজীর সঙ্গে একসঙ্গে ছিলাম বা ভ্রমণাদির সময় কোথাও কোথাও তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও হয়েছিল। একবার আমি ও কাশীর ব্রহ্মচারী হারাণ উত্তরাখণ্ডের তীর্থাদি দর্শন মানসে বেরিয়েছিলাম। প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনে যাবার পথে হাত্‌রাস্ জংশনে নেমে শুনতে পেলাম যে, স্বামিজী ওখানে রয়েছেন এক রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বাসায়। তিনি তখন জ্বরে ভুগছিলেন। ঐ খবর পেয়েই আমরা স্বামিজীর

সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের সঙ্গে দেখা হতেই তাঁর ভারি আনন্দ। ঐ জ্বরগায়েই কত কথা—কত হাসিতামাসা, রঙ্গরসিকতা ও আনন্দ যে করতে লাগলেন তা আর কি বলব? ওখানে ২।৩ দিন থাকার পরেই স্বামিজীর জ্বর ছেড়ে গেল; কিন্তু তাঁর শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি আমাদের বৃন্দাবন দর্শন করে আসতে বললেন। বৃন্দাবন হতে ফিরে এসে স্বামিজীর সঙ্গে সকলে হৃষীকেশ যাব স্থির হল; ততদিনে তাঁর শরীরও সুস্থ সবল হয়ে উঠবে।

আমি ও হা— বৃন্দাবন দর্শনে গেলাম। সেখানে কয়েক দিন খুবই আনন্দে কাটল। বৃন্দাবন কি কম স্থান গা? স্বয়ং শ্রীভগবানের লীলাস্থল। ওস্থানের আধ্যাত্মিক আবহাওয়াই স্বতন্ত্র। বৃন্দাবন থেকে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডে গেলাম। পথে একস্থানে হা— ব্রহ্মচারী নিজের পুঁটলিটী রেখে শৌচাদিতে গেছে; ইতি মধ্যে ঐ পুঁটলিটী চুরি হয়ে গেল। আমাদের দুজনের যা সামান্য টাকাকড়ি ছিল তা আমার কাছেই থাকত; কিন্তু হা— আবার একখানি দশ টাকার নোট তার পুঁটলির ভিতর আলাদা রেখে দিয়েছিল। তাই পুঁটলি চুরি হওয়ায় তার মহা দুঃখ। সে একেবারে মনমরা হয়ে গেল। স্বামিজীর সঙ্গে পরে দেখা হতে তিনি শুনে খুব হাসাহাসি ও আনন্দ করেছিলেন। বৃন্দাবনের সব দর্শনীয় স্থানাদি দেখে হাত্রাসে ফিরে এসে দেখি যে, স্বামিজী ফের জ্বরে পড়েছেন—খুব বেশী টেম্পারেচার। আর ক্রমাগত জ্বরে ভুগে ভুগে তাঁর শরীরও খুব দুর্বল এবং কৃশ হয়ে গিয়েছে। তখন ওখানে আর না থেকে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়াই স্থির

করলাম – তিনিও তাতে রাজী হলেন। তদনুসারে সব খবর জানিয়ে কলকাতায় ও মঠে চিঠি লেখা গেল। এদিকে হাতরাসে সব রেল-কর্মচারী ও অন্যান্য বিশিষ্ট লোক অনেকেই স্বামিজীর খুব ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন খুব জমিয়ে নিতেন। যে একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করত সেই একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেত—এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁরা কিছুতেই স্বামিজীকে ছেড়ে দিতে চান না। শেষটায় অনেক বুঝিয়ে তাঁদের রাজী করে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট হতে কিছু টাকা হাওলাত করে তাঁকে নিয়ে মঠের দিকে রওনা হলাম। তাতে হা— আমার উপর ভারি অসন্তুষ্ট হল ; তাকে নিয়ে কেন আমি হরিদ্বারে গেলাম না—এই তার দুঃখ। সে আমায় বলতে লাগল—'সাধু হয়েছেন তা এখনও এত মায়া কেন ? স্বামিজীকে সঙ্গে করে নিয়ে না গেলেই নয় ? সাধুর অত মায়া থাকা ভাল নয়' ইত্যাদি। আমি তখন তাকে বল্লাম—'আরে ভাই ! তুমি তো জান আমরা সাধু হয়েছি বটে, কারও উপর মায়া থাকা ঠিক নয় তাও সত্য ; কিন্তু গুরুভাইদের উপর একটু মায়া আমাদের আছে এবং তা থাকবেও। এ আমাদের ঠাকুরের শিক্ষা। তিনি আমাদের গুরুভাইদের পরস্পরের উপর এ টান রেখে দিয়েছেন। বিশেষতঃ স্বামিজী হলেন আমাদের সকলকার মাথার মণি। তাঁর জন্য আমরা নিজেদের প্রাণপাত করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিনে ! বুকের রক্ত দিয়েও তাঁর সেবা করতে পারলে তাতে নিজেদের ধন্য মনে করব। স্বামিজী যে কী জিনিস তা তুমি কি বুঝবে ?' আমার কথা শুনে হা— চুপ করে রইল। হাতরাসের ভক্তদের বলে হা—এর হৃষীকেশ যাবার

ব্যবস্থা করে দিলাম। তারাই তাকে টিকেট করে হৃষীকেশের দিকে রওনা করে দিল।

"স্বামিজীকে নিয়ে তো কল্‌কাতার দিকে রওনা হলাম। এদিকে নিরঞ্জন স্বামী স্বামিজীর জ্বরের খবর পেয়ে অমনি মঠ হতে হাত্‌রাসের দিকে রওনা হয়েছিলেন। আমরা বোধ হয় এলাহাবাদে দু গাড়ীতে ক্রস্ (পাশকেটে অতিক্রম) করি—কেউ কাউকে দেখতে পেলাম না। পরে মঠে এসে ডাক্তার বিপিনবাবুকে দেখান হল। তাঁরই চিকিৎসাতে স্বামিজী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

"তার পরে অনেক ঘোরাঘুরি করে স্বামিজী কয়েকজন গুরুভাইকে সঙ্গে করে হৃষীকেশে তপস্যায় গেলেন। দিনরাত কঠোর তপস্যা ধ্যান জপ ও বেদান্তচর্চা খুব চলেছিল। স্বামিজী বলতেন যে, এমন আনন্দে কখনও থাকেন নি। তখন বর্ষাকাল। অন্যান্য সাধুরা বড় একটা কেউ ওখানে থাকতেন না। একমাত্র ছত্রই সম্বল। সে সময় হৃষীকেশ বাস্তবিকই তপস্যার অনুকূল স্থান ছিল। এখন তো হৃষীকেশ ছোটখাট সহর হয়ে গেছে। কিছুকাল কঠোর তপস্যা ও বেদান্তচর্চায় খুব আনন্দে কাটবার পরেই স্বামিজীর জ্বর হল। হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি গুরুভাইরা স্বামিজীর সঙ্গে ছিলেন। জ্বর ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। ওখানে তখন ডাক্তার কবিরাজও ছিল না। তাই সকলেই স্বামিজীর জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একদিন হঠাৎ এমন হয়েছিল যে, জ্বর খুব বাড়ার পরে ক্রমে কমতে কমতে স্বামিজীর সব শরীর একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে নাড়ী ছেড়ে গিয়েছিল—শুধু মাথাটা একটু গরম ছিল। কথাবার্তা সব বন্ধ—বাঁচবার আর কোন আশা ছিল না।

সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সকাতরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'ঠাকুর, এ বিপদ হতে আমাদের উদ্ধার কর, নরেনকে ভাল করে দাও। যদি এঁকে নাও তো আমাদেরও রেখো না— আমাদেরও নিয়ে যাও।' সকলেই মহা বিপন্ন হয়ে পড়লেন, অথচ কিছু করবার ছিল না। ভাইদের মধ্যে একজন গঙ্গায় গিয়েছিলেন, তখন একজন সাধু গঙ্গাতে স্নান করছিলেন। সাধুটী অতি প্রাচীন, ওদেশীয় এবং বরাবর হৃষীকেশেই থাকতেন। তিনি সেই গুরু-ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?' গুরুভাইটী স্বামিজীর অবস্থার কথা সব বললেন। তখন সেই সাধুটী এসে স্বামিজীকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বল্লেন— 'তোমরা কিছু ভেবো না। আমি একটী ঔষধ দিচ্ছি, ঐ ঔষধ পিপুল চূর্ণ ও মধু দিয়ে মেড়ে এঁর জিবে লাগিয়ে দাও, দেখবে ইনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।' এই বলে নিজ কুটিয়ায় গিয়ে ভস্মের মত একটু ঔষধ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুপানাদি সব জোগাড় করে এনে যেমন যেমন ঐ সাধুটী বলেছিলেন সে ভাবে ঔষধ স্বামিজীর জিবে লাগিয়ে দেওয়া হল। আশ্চর্য যে, ঐ ঔষধ খাওয়াবার অল্প-ক্ষণের মধ্যেই স্বামিজীর শরীর গরম হতে লাগল এবং তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন। তখন স্বামিজী সব ঘটনা শুনে ধীরে ধীরে বল্লেন—'কেন তোরা আমায় ঔষধ খাওয়াতে গেলি? আমি যে খুব আনন্দে ছিলাম।' স্বামিজী ক্রমে কতকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন; কিন্তু দারুণ বর্ষাকালে ঐ ম্যালেরিয়ার মধ্যে হৃষীকেশে আর থাকা কিছুতেই সঙ্গত নয় মনে করে স্থানান্তরে যাওয়াই স্থির হল। কিন্তু স্বামিজীর শরীর তখনও এত দুর্বল যে, তিনি কি ভাবে যে অন্যত্র

যাবেন তাই হল এক সমস্যা। সে সময় টিহিড়ি গাড়োয়ালের রাজা কোন কাজে ঐ অঞ্চলে এসেছিলেন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাই রঘুনাথ শাস্ত্রী তখন টিহিড়ি রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁকে সব ব্যাপার বলাতে তিনি হৃষীকেশ হতে হরিদ্বার পর্যন্ত গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিলেন। হরিদ্বারে দিন কতক কাটিয়ে স্বামিজী মিরাটে এলেন। সেখানেও গুরুভাইরা সব তাঁর সঙ্গে এসে জুটলেন। মিরাট বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। ওখানে দু তিন মাস থাকার পরে তাঁর শরীর বেশ সেরে গেল। তখন তিনি একদিন বলেছিলেন—'এবার আমার খুব একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। এখন থেকে আর গুরুভাইদের সঙ্গে থাকব না, একলা থাকব। আমার অসুখে তোমাদের কত বিব্রত হতে হয়েছে। কোথায় সব তপস্যা করতে গিয়েছিলে, তা না করে আমার সেবা করতেই সকলকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। আবার তোমাদের কারও অসুখ করলে আমাকে তার চাইতেও বেশী করতে হবে। গুরুভাইদের ভালবাসাও এক রকম বন্ধন। এ বন্ধনও কাটাতে হবে।' তিনি করেছিলেনও তাই। তারপর থেকে আমেরিকা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একা একা সারা ভারত ঘুরেছিলেন—কেউ তাঁর কোন খোঁজ পায় নি।"

অতঃপর জনৈক সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন—"স্বামিজীর দেহত্যাগের সময় কি আপনি মঠে ছিলেন?"

মহাপুরুষজী—"না, তখন আমি মঠে ছিলাম না। তার দশ বার দিন পূর্বে স্বামিজীই আমাকে অনেক করে বলে কাশীতে বেদান্ত প্রচারের কাজ শুরু করতে পাঠান। জুন মাসের শেষ ভাগে আমি কাশীতে ঐ কাজের জন্য যাই। স্বামিজী যখন

শেষবার কাশীতে আসেন তখন আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সে সময় ভিঙ্গার মহারাজা কাশীতে বেদান্ত প্রচারের একটি প্রতিষ্ঠান করবার জন্য স্বামীজীকে পাঁচ শত টাকা দেন। উক্ত মহারাজা তাঁকে খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে নিজরাজ্য ছেড়ে কাশীতে দুর্গা-বাড়ির নিকট একটি বাগানবাড়ি তৈরী করে সেখানে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে থাকতেন, নিজের বাড়ির সীমানার বাইরে যেতেন না। স্বামিজী কাশীতে এসেছেন খবর পেয়ে একদিন জনৈক কর্মচারীর হাতে প্রচুর ফল মিগান্নাদি পাঠিয়ে স্বামিজীকে তাঁর বাড়িতে পদধূলি দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠান এবং আরও বলে পাঠান যে, তিনি ব্রত নিয়েছেন—নিজ বাড়ির সীমানার বাইরে যাবেন না, সেজন্য স্বামিজীর শ্রীচরণে উপস্থিত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। মহারাজার ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে স্বামিজী বল্লেন—'আমরা সাধু, যখন নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন তখন কেন যাব না? নিশ্চয় যাব।' তিনি সেই মগারাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তাঁর বাড়িতে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মহারাজ খুব ভক্তিভাবে স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বললেন—'আমি আপনার কার্যাবলী অনেক বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করে আসছি এবং তাতে যারপরনাই আনন্দ অনুভব করছি। আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আপনাকে দেখলে মনে হয় বুদ্ধদেব, শঙ্কর প্রভৃতি অবতার পুরুষগণ যেমন ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জগতে এসেছিলেন তেমনি আপনারও সে জন্য দেহধারণ। আপনার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হোক এই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।' সে সময় কাশীতেও কিছু প্রচার কার্য যাতে হয় সে জন্য স্বামিজীকে অনুরোধ করে তিনি

পাঁচ শত টাকা দিতে চেয়েছিলেন। স্বামিজী তখন সে টাকা নিলেন না; বল্লেন যে পরে এ বিষয়ে ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই মহারাজ স্বামিজীর নিকট পাঁচ শত টাকা পাঠিয়ে দেন এবং পুনরায় কাশীতে কাজ আরম্ভ করবার জন্য অনুরোধ করে পাঠান। তখন স্বামিজী সেই টাকা গ্রহণ করেন।

"মঠে ফিরে স্বামিজী প্রথম শরৎ মহারাজকে কাশীতে যাবার কথা বলেন। শরৎ মহারাজ তাতে রাজী হলেন না, বল্লেন—'কাশীতে আমার সুবিধে হবে না।' কাজেই তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ কাশী যাবার কথা বলতে লাগলেন। তখন তাঁর শরীর খুবই খারাপ, ডায়াবিটিস্ (বহুমূত্র) অত্যন্ত বেড়েছিল। আমি তাঁকে ঔষধ ইত্যাদি খাওয়াতাম এবং তাঁর সেবার তত্ত্বাবধান করতাম। তাই তখন তাঁর সেবা ছেড়ে গেলাম না পরে তাঁর শরীর যখন অনেকটা সেরে উঠল তখন আমায় কাশীতে পাঠিয়ে দিলেন।"

জনৈক সন্ন্যাসী—"কাশী সেবাশ্রমের কথা উল্লেখ করে মাষ্টার-মশাই বলতেন—শিবানন্দের ধ্যানে কাশী সেবাশ্রম কি রকম জেগে উঠেছে দেখ।"

মহাপুরুষজী—"সে কি কোন কথা? সবই তাঁর ইচ্ছায়, তাঁরই কৃপায় হয়। ঠাকুরের ভাব দিন দিনই আরও বেশী প্রচার হবে। এ যুগধর্মের প্রভাব। দেখ না বোম্বেতেই প্রথমটায় কি ছিল এখন কত কি হচ্ছে! কালে আরও কত হবে! সব তাঁর লীলা!"

পরে জনৈক পার্শী ভক্ত মহিলার গানের কথা উঠতে বল্লেন—"আহা কি ভক্তির সহিত 'মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরা ন কোই' এ গানটি গায়।" এই বলে তিনি নিজেই গানটি গাইতে লাগলেন।

কাশী

১৯২৭-২৮

কাশীতে অবস্থানকালে মহাপুরুষ মহারাজ প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্ত নরনারীকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। কাশী শিবক্ষেত্র, সে জন্য ইতঃপূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বা স্বামী সারদানন্দ মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে কেউই কাশীতে মন্ত্রদীক্ষা দেন নি। অথচ মহাপুরুষ মহারাজ এ নিয়মের ব্যতিক্রম কেন করলেন—তা ভেবে অনেক সাধু ও সেবকদের মনে কেমন একটা খট্‌কার সৃষ্টি হয়েছিল। সে সন্দেহ নিরাকরণের জন্য একদিন জনৈক সেবক তাঁকে জিজ্ঞাসা করে—"মহারাজ, আমাদের মনে একটা সন্দেহ এসেছে; আপনি দয়া করে সে সন্দেহটা মিটিয়ে দিন। শুনেছিলাম যে, রাজা মহারাজ প্রভৃতি কেউই কাশীতে দীক্ষা দিতেন না, অথচ আপনি তো এখানে দীক্ষা দিচ্ছেন?"

সেবকের এই প্রশ্ন শুনে তিনি খানিকক্ষণ খুব গম্ভীর ও মৌন হয়ে রইলেন। পরে ধীরে ধীরে বল্লেন—"দেখ বাবা, আমি দীক্ষা দিচ্ছি এ বুদ্ধি আমার মোটেই নেই। ঠাকুর কৃপা করে আমার ভেতর গুরুবুদ্ধি কখনও দেন নি। জগদ্‌গুরু হলেন শঙ্কর—আর এ যুগে ঠাকুর। তিনি ভক্তদের প্রাণে প্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন; আবার তিনিই আমার ভেতরে বসে যা বলান আমি তাই বলে দিই মাত্র। ঠাকুর হলেন আমার অন্তরাত্মা।"

* * *

কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমের দোতলার উপরের একটী কোণের ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন। শীতকাল। অনেক সাধু ব্রহ্ম-চারীতে দু আশ্রমই ভরপুর। অনেকে মহাপুরুষজীর পূতসঙ্গ লাভ করবার জন্যও তথায় সমবেত। আর নিত্যই বহু ভক্তের ভিড়—যেন ছোটখাট উৎসব, আনন্দের মেলা। একদিন সকালে যথারীতি দু আশ্রমের সাধুগণ একে একে তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন, এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করে তিনি বল্লেন—"দেখ, কাল রাত্রে একটা ভারি মজা হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি, হঠাৎ দেখি যে, এক শ্বেতকায় পুরুষ, জটা জুটধারী, ত্রিনয়ন সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিব্যকান্তিতে চারিদিক আলোকিত হয়ে গেছে। আহা! কী সুন্দর কমনীয় মূর্তি,—কী সকরুণ চাহনি! তাঁকে দেখা মাত্রই ভেতর থেকে মহাবায়ু একেবারে গর গর করে উপরের দিকে উঠতে লাগল,—ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম, খুব আনন্দ! এমন সময় দেখি যে, সে মূর্তি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন এবং তাঁর স্থানে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন—সহাস্য বদন। আমায় হাত দিয়ে ইসারা করে বল্লেন—'তোর এখনও থাকতে হবে, আরও কিছুকাল বাকী আছে।' ঠাকুর এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই মন আবার নীচের দিকে আসতে লাগল এবং ক্রমে বায়ুর ক্রিয়াও চলতে লাগল। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি কিন্তু বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।"

সন্ন্যাসী—"আপনি কি স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন?"

মহাপুরুষজী—"না হে, জেগে জেগে।" এইমাত্র বলেই সে কথা চাপা দিয়ে অন্য কথার অবতারণা করলেন।

বেলুড় মঠ

মঙ্গলবার, ১৯শে মার্চ, ১৯২৯

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের শরীর আজ তত ভাল নয়। মাত্র দু দিন পূর্বে রবিবারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট উৎসব খুব সমারোহে সম্পন্ন হয়ে গেছে। প্রায় দেড় লক্ষ লোক ঐ উৎসবানন্দে যোগদান করেছিল। সেদিন খুব ভোর হতে অনেক রাত পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত নরনারী মহাপুরুষজীর দর্শনলাভে ধন্য হয়েছিল। ভক্তদের জন্য সর্বক্ষণ অবারিত দ্বার। তিনিও ঠাকুরের ভাবে এত মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, শরীরের দিকে তাঁর মোটেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না—যেন দৈববলে বলীয়ান হয়ে অক্লান্তভাবে সকলের সঙ্গে আনন্দে ঠাকুরের প্রসঙ্গ করছিলেন এবং নানাপ্রকার ধর্মোপদেশ দানে ভক্তদের প্রাণে বিমল আনন্দসুধা বর্ষণ করছিলেন। সে দিনের অতিরিক্ত ক্লান্তির দরুণ শরীর আজ আরও বেশী খারাপ হয়েছে; কিন্তু তিনি সদাপ্রফুল্ল, সর্বদা আনন্দময়!

আজ সকাল থেকেই মঠের সাধুব্রহ্মচারীরা একে একে ভক্তিনম্রভাবে তাঁর ঘরে সমবেত হচ্ছেন। তিনিও সকলকে কুশল প্রশ্নাদি করছেন। একজন সন্ন্যাসীর পরিধানে জীর্ণবস্ত্র দেখে তখনই তাঁকে একখানি নূতন কাপড় দেবার জন্য নিকটস্থ সেবককে আদেশ করলেন

এবং সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন—"সাধুদের কার কি দরকার না দরকার তাও তোমরা একটু খোঁজ খবর রাখতে পার না ?"

জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁর সামনে আসতেই—"ওঁ নমো শিবায়, জয় মা" বলে অভিবাদন করলেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের সম্বন্ধে কথা উঠল। নব দীক্ষিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সকলেই আজ দক্ষিণেশ্বরে মাকে দর্শন করতে যাবেন্ এবং সমস্ত দিন তথায় ধ্যানভজনাদিতে অতিবাহিত করবেন। মন্দিরের পরিচালকগণ তথায় ত্রিশ জন সাধুর প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করেছেন। সব শুনে মহারাজ খুব প্রফুল্ল হয়ে বল্লেন,—"দক্ষিণেশ্বর আমাদের ভূস্বর্গ, আমাদের কৈলাস, বৈকুণ্ঠ। ও কি কম স্থান গা ? পঞ্চবটী মহা সিদ্ধপীঠ। ঐ পঞ্চবটীতে ঠাকুরের কত ভাব মহাভাব হয়েছিল। ঠাকুর বার বৎসর ধরে কত বিভিন্ন ভাবের সাধনা ঐ দক্ষিণেশ্বরে করেছিলেন। কত দিব্য দর্শন, কত দিব্য অনুভূতি ওখানে তাঁর হয়েছিল, যার তুলনা হয় না। আর কোন অবতার পুরুষের জীবনে এত কঠোর ও বিভিন্ন ভাবের সাধনা ও এত উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় না। ঠাকুর বলতেন—'এখানকার সব অনুভূতি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গিয়েছে।' তাই তো স্বামীজি ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—'অবতারবরিষ্ঠায়।' ঠাকুর বৃন্দাবনের রজঃ এনে পঞ্চবটীতে ছড়িয়ে-ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। স্বয়ং শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। অদ্বৈতবাদী কি দ্বৈতবাদী, শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব, শৈব বা তান্ত্রিক সকলের কাছেই দক্ষিণেশ্বর মহাপীঠ। কারণ ঠাকুর সব ভাবের সাধনা করে ওখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এবার ভগবানের মহাসাত্ত্বিক

ভাবের বিকাশ। স্বয়ং আদ্যাশক্তি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধারভূতা সেই জগজ্জননী—স্বয়ং ঠাকুরের দেহ আশ্রয় করে লীলা করেছেন। ঠাকুরের অলৌকিক তপস্যায় 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' ইত্যাদি লোক সমুদয় পর্যন্ত উপকৃত হবে। উঃ, কী শক্তির খেলা!" বলতে বলতে মহাপুরুষজীর সমগ্র মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল এবং তিনি অধোবদনে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

দুপুরে সবেমাত্র মহাপুরুষজী আহারে বসেছেন এমন সময় স্বামী— এসে প্রণামান্তর জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনার শরীর আজ কেমন আছে, মহারাজ?'

মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ধীরে ধীরে বল্লেন —"এ শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করছ? শরীর এখন টলটলায়মান অবস্থায়, কখন যে কি হয় তার কিছুই স্থিরতা নেই। এখন তোমরা সব ঠাকুরের কাজকর্ম দেখেশুনে নাও। এবার ঠাকুর আমায় রেহাই দেবেন মনে হচ্ছে। শরীরের ভেতরটা একেবারে ফাঁপা হয়ে গেছে, জোর মোটেই নেই। তবে মনের শক্তি তিনি দিন দিন খুব বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমি তো এখন নির্বাণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি—সামনে দেখছি সেই বিরাট অনন্ত ধাম। ঠাকুর কৃপা করে ক্রমে ক্রমে সব খুলে দিয়েছেন —নির্বাণের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। বাস্, ঠাকুর সব দেখিয়ে দিয়েছেন, পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, (চক্ষু মুদ্রিত করে) এখন আর কোন ভাবনা নেই—শরীর যাক্ আর থাক্।"

সন্ন্যাসী—"সে কি মহারাজ! আমাদের তো দৃঢ় ধারণা ঠাকুর

বহু লোকের কল্যাণের জন্য—এই সঙ্ঘের কল্যাণের জন্য আপনাকে আরও দীর্ঘকাল নিশ্চয়ই রেখে দেবেন। আজকাল আপনার ভীষণ ক্লান্তি যাচ্ছে, তাতেই শরীর বেশী খারাপ হয়েছে। আপনার যাতে কোন প্রকার ক্লান্তি না হয় তার জন্য আমরা সকলেই খুব চেষ্টা করছি। আপনার শরীর যতদিন আছে—বহু লোকের কল্যাণ হয়ে যাচ্ছে—আমরাও কত নিশ্চিন্ত আছি।"

মহাপুরুষজী—"তোমরা সকলে যে আমায় খুব ভালবাস তা আমি খুব জানি এবং আমিও তোমাদের মত সাধু ভক্ত সঙ্গে বেশ আনন্দেই আছি। আর এও ঠিক জেনেছি যে, এ শরীরদ্বারা তাঁর যতটুকু কাজ হবার তাও কড়ায় গণ্ডায় তিনি করিয়ে নেবেন; তার পূর্বে ঠাকুর ছাড়বেন না। এক এক সময় ভাবি ঠাকুর এ শরীরটা এখনও কেন রেখেছেন? নিশ্চয়ই তাঁর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। নইলে তিনি এ ভাঙ্গা শরীরটা নিয়ে এখনও এত নাড়াচাড়া কেন করবেন? আমার বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, আমি বলতে কইতে পারি নে—তবু তিনি তাঁর এ ভাঙ্গা যন্ত্রটা দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।"

স্বামী—অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করবার মানসে বল্লেন—"গঙ্গাধর মহারাজকে আনতে এরা তিন জন গিয়েছে।"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, গঙ্গাধর আসে তো বেশ হয়। ঠাকুরের লোক, দেখলেও কত আনন্দ হয়। ওকে ধরে পাক্‌ড়ে না আনলে ও আসতে চায় না। খোকাও তো আজ আসছে। আহা, খোকা মহারাজের শরীরটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে! তোমার খাওয়া দাওয়া হয়েছে?"

সন্ন্যাসী—"না, এখনও হয় নি। আজ সকাল থেকেই আপনার কাছে আসব আসব করছি, কিন্তু সময় করে উঠতে পারি নি—আপনার কাছে তো প্রায় সব সময়ই ভক্তদের ভিড় লেগেই থাকে।"

মহাপুরুষজী—"আহা, তবে যাও যাও, খাও গে; আর বেশী দেরী করো না।"

এই কথা বলাতে স্বামী— চলে গেলেন। মহাপুরুষজী চোখ বুজে আপন মনেই বল্লেন,—"প্রভু, সকলের কল্যাণ কর, সকলের চৈতন্য কর।"

আহারান্তে একজন সেবক তাঁকে খাবার আসন হতে সযত্নে তুলে দিল। আজকাল নিজে উঠতে তাঁর খুবই কষ্ট হয়। তিনি ধীরে ধীরে চেয়ারে বসলেন। তাঁর ঘরের সামনের দিকের জায়গায় জনৈক সন্ন্যাসী কুঁজো হতে জল গড়িয়ে খাচ্ছিলেন দেখে তিনি বল্লেন—"এই যে — তো এবার চলল।"

সন্ন্যাসী—"আজ্ঞে হাঁ। আগামী বৃহস্পতিবার যাব মনে করেছি।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মহাপুরুষজী বললেন—"তা যাও। সকলেই যাবে। এই তো সংসার। দুদিনের জন্য দেখাশুনা, তার পরে কে কোথায়? পরমানন্দময়ী মা-ই সত্য, আর সব দুদিনের। সৃষ্টি প্রবাহাকারে নিত্য নিরন্তর চলছে, বিরাম নেই। এই সব সৃষ্টির পরপারে নিত্যানন্দময়ী মা—বাক্যমনের অতীত 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'।"

বেলুড় মঠ

শুক্রবার, ২২শে মার্চ, ১৯২৯

মহাপুরুষজী দ্বিপ্রহরে তাঁর ঘরের মেজেতে আহারে বসেছেন। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন যে, একজন মুচী মঠের উঠানে আমগাছের নীচে বসে মঠের সাধুব্রহ্মচারীদের জুতো সেলাই করছে। আহার শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে জনৈক সেবককে বল্লেন—"আহা! এ ছুপুর বেলা আমরা সকলে খেলুম আর এ বেচারী অভুক্ত এখানে বসে কাজ করছে! একে বেশ ভাল করে ফলমিষ্টি প্রসাদ দিয়ে এস তো।" আদেশ মত সেবক মুচীকে ফল মিষ্টান্নাদি প্রসাদ দিয়ে ফিরে এসে দেখে যে, মহাপুরুষজী খাবার আসন হতে উঠে পড়েছেন, এবং জানালায় দাঁড়িয়ে মুচীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন—হাতে একটী আধুলি। মুচী প্রসাদ পাওয়া মাত্রই হাতের কাজ বন্ধ করে খেতে আরম্ভ করেছে দেখে মহাপুরুষজী বল্লেন—"আহা! দেখছ, ওর খুবই খিদে পেয়েছিল, তাই প্রসাদ পাওয়া মাত্রই খেতে শুরু করেছে। দাঁড়াও আমি একটা মজা করছি, দেখবে।" এই বলেই হাতের আধুলিটী মুচীর সামনে ছুঁড়ে দিলেন। মুচী অপ্রত্যাশিত ভাবে আধুলিটী উপর হতে পড়েছে দেখে উপরের দিকে তাকাতেই মহাপুরুষজীকে দেখতে পেয়ে সব ব্যাপার বুঝতে পেরে করযোড়ে তাঁকে প্রণাম করে

হৃদয়ের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। খানিক পরে জনৈক সন্ন্যাসীকে জুতো সেলাই করা নিয়ে মুচীর সঙ্গে দর কষাকষি করতে দেখে তিনি খুবই ব্যথিত চিত্তে বল্লেন—"আহা, গরীব লোক, এর সঙ্গে আবার দর-দস্তুর করা কেন?"

* * *

রাত্রে মহাপুরুষ মহারাজ খুব সামান্যই আহার করেন—কোন দিন খালি একটু দুধ বা দুটী মনাক্কা বা প্রুন (Prune) দুধে ফেলে খান। আজ রাত্রিতেও একটু দুধ খাচ্ছিলেন। এমন সময় স্বামী— এসে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। নানা প্রসঙ্গের পরে ক্রমে মঠ ও মিশনের কাজকর্ম সম্বন্ধে কথা হতে লাগল। মহাপুরুষজী বলছেন—"এখন তোমরা সকলে এসেছ, আমার খুবই আনন্দ হয়েছে। ঠাকুর এক একটা নাড়াচাড়া দিয়ে তাঁর সঙ্ঘশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে দিচ্ছেন আর দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর কাজ একা কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা হবার নয়—এই সমস্ত সাধুমণ্ডলী একত্রিত হয়ে করবে এবং তখনই সব সুনিয়ন্ত্রিত হবে। আর যত ঝড়-ঝাপটা, আপদ বিপদ আসবে ততই ঠাকুরের সঙ্ঘশক্তি জেগে উঠবে। 'শ্রেয়াংশি বহু বিঘ্নানি', যত বাধা বিপত্তি আসবে ততই বেড়ে যাবে ঠাকুরের উপর সকলকার ভক্তি-বিশ্বাস ও নির্ভরতা। তাঁর যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্যই এই সঙ্ঘের সৃষ্টি এবং তিনি এই সঙ্ঘের প্রতি অঙ্গের ভেতর দিয়ে কাজ করছেন। আর এই যুগপ্রবর্তনের কাজ বহু

শতাব্দী ধরে অবাধে চলবে—কেউ এর গতি রোধ করতে পারবে না। এ বাবা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি স্বয়ং স্বামিজীর কথা।"

সন্ন্যাসী—"স্বামিজী যা বলে গেছেন আর আপনারাও যা বলছেন তা কখনই মিথ্যা হবার নয়। কিন্তু মহারাজ সময় সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে মনে সে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখা বড়ই মুস্কিল হয়ে পড়ে, কাজকর্ম করার উৎসাহ একেবারে দমে যায়—যেন কেমন একটা ভয় ও অবিশ্বাস এসে মনকে ঘিরে ফেলে।"

মহাপুরুষজী—"তাতো হবারই কথা। বহুবার ভয় হবে, বিতৃষ্ণা আসবে, আবার সব কেটে যাবে। কাজের ধারাই এই। জগতে এমন কোন্ কাজ আছে যা অবাধে হয় বল? কাজ যত বড়, বাধা-বিঘ্নও তার তত বেশী এবং সেই সংঘর্ষের দ্বারাই আত্মশক্তি জেগে উঠে। সেই শক্তি আর কেউ নয়, স্বয়ং 'মা'। কাজকর্ম সব তাঁর, আর আমরাও তাঁরই। সত্য পথে থেকে এই জ্ঞান পাকা রেখে কাজ করে যেতে হবে। এ যে যুগধর্ম সংস্থাপনের কাজ। তাই তো তিনি আমাদেরও এতে টেনে এনেছেন। নইলে আমরা কি আর ভজনসাধনে মগ্ন হয়ে থাকতে পারতাম না? করছিলামও তো তাই; কিন্তু ঠাকুরের দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হয়ে স্বামিজীই এসব কাজের প্রবর্তন করলেন এবং আমাদের সকলকেও টেনে আনলেন। দেখ না, স্বামিজী নিজেই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কী অক্লান্তভাবে কাজ করে গেলেন। খেটে খেটে তাঁর দেহ নাশ হয়ে গেল। আর তাঁর

পক্ষেও কি সব কাজ নির্ঝঞ্ঝাটে করা সম্ভব হয়েছিল? তাঁর পাশ্চাত্য দেশে যাবার ব্যাপারই দেখ না। কত শত বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে তাঁকে শ্রীভগবানের কাজ করতে হয়েছিল। আমার তো সময় সময় মনে হয় যে, আর ঠাকুরের সগুণ ভাব নিয়ে থাকব না, একেবারে নির্গুণ অবস্থায় চলে যাই—সমাধিস্থ হয়ে বুঁদ হয়ে থাকি, কিন্তু ঠাকুর তা করতে দিচ্ছেন কোথায়? অবশ্য তিনিই সব; সগুণও তিনি আবার নির্গুণও তিনি। 'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমাদের কিছুই করবার জো নেই। তিনি যখন যে অবস্থাতে রাখেন তখন সেই অবস্থাতেই থাকতে হবে। তবে তিনি কৃপা করে সব দেখিয়ে দিচ্ছেন—সেই অমৃতধামের রাস্তা খুলে দিয়েছেন। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'—যাঁকে ধরতে না পেরে মনের সঙ্গে বাক্য তাঁ থেকে ফিরে আসে।"

বেলুড় মঠ

শনিবার, ২৩শে মার্চ, ১৯২৯

গত কয়েকদিন যাবৎ মহাপুরুষ মহারাজের খুবই সর্দি হয়েছে। আজ সর্দির ভাবটা ওরই মধ্যে একটু কম। শারীরিক অসুস্থতার দিকে তাঁর মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই—খুব অসুখের সময়ও তিনি সদানন্দ। দেহের কষ্ট বা বিপদ আপদ তাঁর কূটস্থ মনের উপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

সকালবেলা প্রায় ৮টার সময় জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী এক শাখা কেন্দ্র হতে এসে পৌঁছেছেন। তিনি উপরে এসে মহাপুরুষজীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজ, আপনার শরীর কেমন?"

মহাপুরুষজী—"এ অনিত্য শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করছ? এ বৃদ্ধ বয়সে শরীর কি আর ভাল থাকে?"

সন্ন্যাসী—"তাই তো দেখছি, মহারাজ, আপনার শরীর কি হয়ে গেছে। দেখলেও কষ্ট হয়।"

মহাপুরুষজী—"এ শরীর আর বেশী দিন নয়। শরৎ মহারাজের দেহত্যাগে আমার যেন ডান অঙ্গ ভেঙ্গে গেছে, মন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। আমিও তখনই যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। শরৎ মহারাজের শরীর যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরও খুব খারাপ হয়েছিল। কাজকর্ম থেকে মন একেবারে উঠে গিয়েছিল। ঠাকুরকে ধরেও ছিলাম যে, আমি আর থাকব না। ঠাকুর তা শুনলেন না। তিনি জোর করে রেখে দিলেন, তাই আছি। কেন যে তিনি যেতে দিলেন না তা তিনিই জানেন। সবই তাঁর ইচ্ছা। তিনি যত দিন রাখবেন—থাকতেই হবে।"

সন্ন্যাসী—"তাই বলুন, মহারাজ, যে ঠাকুরের যেমন ইচ্ছা তাই হবে। আমরা ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা করছি যাতে তিনি আপনাকে আরও দীর্ঘকাল আমাদের জন্য রেখে দেন। আপনি চলে গেলে যে সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশই কমে যাবে। আপনাকে হাতেনাতে কোন কাজ করতে হবে

না। আপনি কেবল বসে থাকুন; আপনার ইচ্ছাশক্তিতেই সব কাজ ঠিক ঠিক হয়ে যাবে, যাচ্ছেও। আপনি কেবল আমাদের শক্তি দেবেন, অনুপ্রাণিত করবেন, আশীর্বাদ করবেন। আমরাই সব কাজ করব। যেখানেই থাকি না কেন, মহারাজ, আপনি আছেন এই ভেবেই আমাদের প্রাণে যে কত বল আসে তা আর কি বলব?"

মহাপুরুষজী—"তোমরা আমায় খুব ভালবাস, শ্রদ্ধাভক্তি কর তা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। প্রভুর সঙ্ঘের এই যে পরস্পরের প্রতি প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা—এই হল সঙ্ঘের জীবনীশক্তি। যতদিন পরস্পরের প্রতি এই নিঃস্বার্থ প্রেমের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকবে ততদিন সঙ্ঘের একতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। কারণ এই যে প্রেমের সম্বন্ধ তা ঠাকুরকে নিয়ে। তাঁকে কেন্দ্র করেই এই সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। দেহের নাশে সে সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। আর সঙ্ঘাচার্যগণের যে শক্তি এ সঙ্ঘের ভেতর কাজ করছে তাও কখনও নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এই দেখ না স্বামিজী, মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ—এঁরা একে একে দেহ ছেড়ে চলে গেলেন; কিন্তু তাই বলে তাঁদের উপর আমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল তা কি কমেছে—না তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে—না কখনও যেতে পারে? তা নয়। তাঁরা এখনও আছেন এবং তাঁদের শক্তিও ঠিক কাজ করছে বিভিন্ন আধারের ভেতর দিয়ে। তাঁদের জীবন এখনও আমাদের আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিচ্ছে এবং ঠিক পথে

চালিত করছে। এখন তাঁরা চিন্ময় দেহে রয়েছেন এবং সূক্ষ্মভাবে আরও বেশী কাজ করছেন। এখনও তাঁদের দেখা যায়। আর স্থূল শরীরে থাকতে যেমন ভাবে কাজকর্মের নানা উপদেশ বা আভাস দিতেন এখনও প্রয়োজন হলে তেমনিই দিয়ে থাকেন। মন সমাধিস্থ হয়ে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যখন ঐ সকল মহাপুরুষদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ হয়, এবং তাঁদের কাছ থেকে এমন কি পথের নির্দেশও পাওয়া যায়। আমাদের দেহ নষ্ট হয়ে গেলেও তাঁতে গিয়ে মিশব। তখন ঠাকুরকে চিন্তা করলেই আমাদেরও চিন্তা করা হবে। আমরা তাঁর ভক্ত, তাঁর দাস, তিনি ছাড়া আমাদের পৃথক সত্তা আর কিছুই নেই। আমাদের ব্যক্তিত্ব তাঁতে লয় হয়ে গেছে। আর ঠাকুরই হলেন সনাতন পরব্রহ্ম।"

সন্ন্যাসী—"আমরা তো মহারাজ, স্থূল জগতে আছি—আমরা আপনাকে স্থূলভাবেই পেতে চাই। তা ছাড়া আমাদের মনও অত উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে নি। ঠাকুরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নে। আপনি ঠাকুরের পার্ষদ, তাঁর অন্তরঙ্গ। তাঁরই প্রতিনিধিরূপে আমাদের সামনে রয়েছেন। আমরা আপনার ভেতর দিয়েই ঠাকুরকে বুঝবার চেষ্টা করছি। আপনার কাছে প্রার্থনা জানালেই মনে করি যে, আমাদের প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে পৌঁছে গেল।"

মহাপুরুষজী—"তা আমাদের শরীর গেলেও তোমাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা কখনও যাবে না। আমি খুব আশীর্বাদ করছি, তোমরা খুব বেড়ে যাও; ভক্তিবিশ্বাস, প্রেমপবিত্রতায় তোমাদের

হৃদয় ভরে যাক। জগতের বহুবিধ কল্যাণ তোমাদের দ্বারা সাধিত হোক। ঠাকুর তোমাদের ঠিক চালিয়ে নেবেন, খুব শক্তি দেবেন। ঠাকুর, স্বামিজী এঁরা এসেছিলেন জগতের হিতের জন্য। নূতন আধ্যাত্মিক আলো দিয়ে সমগ্র জগৎকে শান্তির ক্রোড়ে টেনে নেবেন বলেই তো তাঁর নরদেহ ধারণ। আর তাঁর সেই যুগপ্রবর্তনের জন্যই স্বামিজী এ সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। স্বামিজী যে আদর্শ প্রচার করে গেছেন সমগ্র জগৎকে সে আদর্শ ক্রমে গ্রহণ করতে হবে। সমগ্র জগতে শান্তি সংস্থাপনের আর দ্বিতীয় পন্থা নেই।"

বেলুড় মঠ

৪ঠা মে, ১৯২৯

মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে কয়েকজন ভক্ত বসে আছেন, আনন্দে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন; এমন সময় মহাপুরুষজীর নিকট কৃপাপ্রাপ্ত একটী বালিকা ভক্ত তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে কলকাতা হতে এল। মেয়েটীর বয়স তের চৌদ্দ বৎসর, স্কুলে পড়ে। দুজনেই মহাপুরুষজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে সকাতরে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করল। পরে মেয়েটীর মা খুব বিনীতভাবে বললেন—"একে আশীর্বাদ করুন যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে এর ভক্তিবিশ্বাস খুব হয়। আমার তো ইচ্ছা যে, একে বে দেব না। ঠাকুরের নাম করবে, আর আনন্দে থাকবে। বাবা, সংসারে বড় জ্বালা।

আমি নিজে তো ভুক্তভোগী! সংসারে যে কি সুখ তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, তাই আর নিজে জেনে শুনে মেয়েটাকে সংসার-দাবানলে ফেলতে মন চায় না। আপনি একে একটু আশীর্বাদ করুন।"

মহাপুরুষজী—"খুব আশীর্বাদ করছি; মা, খুব আশীর্বাদ করছি।" পরে মেয়েটীর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বল্লেন—"ঠাকুরকে খুব প্রাণভরে ডাক্—আর পবিত্র থাক্। ঠাকুরই পিতা, মাতা, পতি, সখা সবই ঠাকুর।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চসখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥"*

এখন তো পাঠ্য জীবন, মন দিয়ে পড়াশুনা কর, আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের যে নাম পেয়েছ তা জপ কর। পড়াশুনা কর, আর যাই কর মা, জীবনের উদ্দেশ্য হল ভগবান লাভ। সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। এ সংসার তো দুদিনের—ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র নিত্যবস্তু হলেন ভগবান। খুব পবিত্রভাবে থাকবে। সরল, পবিত্র হৃদয়ে ভগবান প্রকাশিত হন। পবিত্রতা হল ধর্মজীবনের একমাত্র ভিত্তি। মাঠাকরুণের জীবনী পড়েছ? এ যুগের সমগ্র নারী-জাতির আদর্শ হলেন তিনি। তাঁর জীবন অতি অদ্ভুত। নরদেহ ধারণ করে সাধারণ গৃহস্থের বধূর মত থাকতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি, জগজ্জননী। শাস্ত্রে যে কালী, তারা, মহাবিদ্যা ইত্যাদি দশ মহাবিদ্যার কথা উল্লেখ রয়েছে, মাঠাকরুণ ছিলেন সেই দশমহাবিদ্যার একজন। ঠাকুরের যুগধর্ম সংস্থাপনরূপ

---

*হে দেবদেব, তুমিই আমার মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ঐশ্বর্য, তুমিই আমার সর্বস্ব।

নরলীলা পূর্ণ করবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁকে সাধারণ মানব কি বুঝবে? আমরাও প্রথমটা তাঁকে কিছুই বুঝতে পারি নি। নিজের ঐশীভাব এত গোপন করে থাকতেন যে, তাঁকে কিছুই বুঝবার জো ছিল না। তিনি যে কি ছিলেন তা একমাত্র ঠাকুরই জানতেন; আর স্বামিজী কতকটা বুঝেছিলেন। স্বামিজী পাশ্চাত্য দেশে যাবার পূর্বে একমাত্র মাকে বলেছিলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে সমুদ্র পারে পাড়ি দিয়েছিলেন। মাও তাঁকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—'বাবা, তুমি দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরে এস; তোমার মুখে সরস্বতী বসুন।' হয়েও ছিল তাই। মায়ের আশীর্বাদে স্বামিজী বিশ্ববিজয়ী হয়েছিলেন। তিনি কখনও এও বলতেন যে, মা ঠাকুরের চাইতেও বড়। এত গভীর ছিল তাঁর শ্রদ্ধা শ্রীশ্রীমায়ের উপর! ঠাকুরও বলেছিলেন—"নহবতে যে আছে সে যদি কোন কারণে কারও উপর বিরূপ হয় তাকে রক্ষা করা আমারও সাধ্যাতীত।" জগতের সমগ্র নারীজাতিকে জাগাবার জন্য মা এসেছিলেন নরদেহে। দেখ না মার আগমনের পর থেকেই সব দেশের নারীজাতির ভেতর কী অদ্ভুত জাগরণ শুরু হয়েছে। তারা এখন নিজেদের জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলবার জন্য এবং সর্ববিষয়ে উন্নত হবার জন্য বদ্ধপরিকর। এখনও হয়েছে কি? এই তো সবে মাত্র শুরু। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে যেমন গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি অদ্ভুত নারীচরিত্রের বিকাশ হয়েছিল। এ যুগে মেয়েদের ভেতর তার চাইতেও বড় বড় আধারের বিকাশ হবে। মেয়েদের ভেতর আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়ে অতি আশ্চর্যজনক

জাগরণ এসেছে; আরও আসবে। এ সব ঐশী শক্তির খেলা। সাধারণ মানুষ এ সকলের গূঢ় মর্ম কিছুই বুঝতে পারে না।"

মেয়ে ভক্ত—"আমি তো মা ঠাকৃরুণের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি নে। তাঁর জীবনী বা উপদেশ কিছুই পড়ি নি। আপনি তাঁর সম্বন্ধে দয়া করে কিছু বলুন। আমার শুনতে খুবই ইচ্ছা হচ্ছে।"

মহাপুরুষজী—"মা তো সকলেরই মা ছিলেন। তাঁর কত দয়া, কত ক্ষমা, আর কী অদ্ভুত সহ্যগুণ ছিল! মাকে আমরাই বা কতটুকু জেনেছি? তবে তিনি কৃপা করে এটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা। তাঁর স্বরূপ যে কি, তা তিনি দয়া করে বুঝিয়ে না দিলে বুঝবার উপায় নেই। প্রথমটায় যোগীন মহারাজ পরে শরৎ মহারাজ মায়ের খুব সেবা করেছিলেন। আমিও একবার জয়রামবাটী গিয়ে মাকে রান্না করে খাইয়েছিলাম। সে বহু দিনের কথা—ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পরে। মা তখন জয়রামবাটী রয়েছেন। আমি, শশী মহারাজ ও আর একজন কে ছিল তা ঠিক মনে নেই, বোধ হয় খোকা মহারাজ। আমরা তিন জনে মাকে দর্শন করতে জয়রামবাটী যাই। তখন জয়রামবাটীতে ভক্তেরা বড় একটা কেউ যেত না। আর যাতায়াতেরও খুব কষ্ট ছিল। আমরা আগে থেকেই মাকে খবর দিয়েছিলাম। আমাদের দেখে মার কি যে আনন্দ! কি যে খাওয়াবেন, কি করে আমাদের সুখী করবেন—তাই নিয়েই সারা দিন ব্যস্ত। জয়রামবাটী তো খুব পাড়া গাঁ—জিনিসপত্র কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু তারি মধ্যে মা গয়লাকে বলে দুধের বন্দোবস্ত,

মেছুনীকে বলে মাছের যোগাড়, আর নানা রকমের তরিতরকারী সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। কল্‌কাতার লোকদের চা খাবার অভ্যাস আছে, মা তা জানতেন। তাই আমাদের জন্য চায়ের যোগাড়ও করে রেখেছিলেন। সারা দিন তো খুব আনন্দে কেটে গেল। আমরা তালপুকুরে খুব নেয়েছিলাম। মা আমাদের সামনে বড় একটা বেরুতেন না, কথাও বলতেন না। রাত্রে খেয়ে দেয়ে শোবার পরে শশী মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, পরদিন মাকে রান্না করে খাওয়াতে হবে। পর দিন সকালে চা-টা খাওয়াব পরে মার কাছে ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করাতে মা তো প্রথমটায় হেসেই আমাদের কথা উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন—'সে কি হয়, বাবা? আমি মা, কোথায় আমি তোমাদের রান্না করে খাওয়াব, না, তোমরা বলছ রান্না করে আমায় খাওয়াবে। আর তোমরা রাঁধতে পারবে কেন? ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তোমাদের চোখ জ্বলে যাবে!' ইত্যাদি অনেক আপত্তি দেখালেন। আমরা মার কথা কিছুতেই শুনলাম না; খুব জেদ্‌ করতে লাগলাম। শেষটায় আমি বল্লাম,—'আমাদের তো ব্রাহ্মণশরীর, আমাদের হাতের রান্না খেতে আপনার কেন আপত্তি হবে? ঠাকুরও তো আমার হাতের রান্না খেয়েছিলেন' ইত্যাদি। অগত্যা মা রাজী হলেন। শশী মহারাজ ও আমি রান্না করলাম। মা খেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন।

মেয়ে ভক্ত—"মহারাজ, আপনি ঠাকুরকেও রেঁধে খাইয়েছিলেন?"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, মা! ঠাকুরের শরীর তখন খুবই অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য কাশীপুর বাগানে রয়েছেন। স্বামিজী প্রভৃতি আমরা সকলেই তাঁর সেবার জন্য ওখানে থাকতাম। আমরা

পালা করে রাতদিন সমভাবে তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকতাম। সকলের খাওয়া দাওয়া ওখানেই হত। সুরেশ বাবু সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রান্না করার জন্য একজন পাচক ব্রাহ্মণও ছিল। একবার সে অসুস্থ হওয়ায় আমরা নিজেরাই পালা করে রান্না করছিলাম। খুব সাধারণ রান্না,—ভাত, রুটী, ডাল, চচ্চড়ি, ঝোল—এই রকম। তখন আমাদের সকলকার মনের অবস্থা এমন যে, খাবার দিকে কারোই আদৌ মন ছিল না—যা জুটত তাই কোন রকমে খেয়ে নিতাম। একে তো ঠাকুরের এমন কঠিন অসুখ, তার উপর আমরা সকলেই তখন খুব কঠোর সাধনভজন করছি। সেই সময় একদিন রাত্রে আমি সকলের জন্য রান্না করছিলাম—ডাল, রুটি আর চচ্চড়ি। চচ্চড়িতে যখন ফোড়ন দিয়েছি, ঠাকুর উপর হতে ফোড়নের গন্ধ পেয়ে জনৈক সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন—'হাঁরে, কি রান্না হচ্ছে রে তোদের? বা! চমৎকার ফোড়নের গন্ধ ছেড়েছে তো! কে রাঁধছে?' আমি রাঁধছি শুনে তিনি বল্লেন—'যা, আমার জন্য একটু নিয়ে আয়।' সেই চচ্চড়ি ঠাকুর একটু খেয়েছিলেন। তখন তো ঠাকুরের কঠিন গলার অসুখ—কোন জিনিসই খেতে পারতেন না। সামান্য একটু দুধে সুজি সিদ্ধ করে দেওয়া হত, তাও তিনি অতি কষ্টে খেতেন। সব সময় তাও খেতে পারতেন না। তার উপর মুহুর্মুহু এত ভাবসমাধি হত যে, বাহ্যিক কোন হুঁশই থাকত না। কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের সেবায় ও ভজন সাধনে কী আনন্দেই না আমাদের দিন কাটত! আমাদের সকলকে একত্রিত করে ভাবী সঙ্ঘের সৃষ্টি করবেন বলেই যেন ঠাকুরের ঐ

অসুখ। অবতারের লীলার গূঢ় রহস্য সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবে?”

এই বলতে বলতে মহাপুরুষজী একেবারে নির্বাক ও স্থির হয়ে গেলেন। খানিক পরে ধীরে ধীরে বল্লেন—‘হাঁ মা, তোমাদের জয়রামবাটীর কথা বলছিলাম। সেবারে মায়ের কাছে আমরা তিন দিন মহা আনন্দে কাটিয়েছিলাম। আহা, মায়ের কী স্নেহ! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সর্বদাই মহাব্যস্ত থাকতেন—যাতে আমাদের কোন কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। আমার তো অল্প বয়সে গর্ভধারিণী মা মারা গিয়েছিলেন; ঠিক মায়ের স্নেহ-যত্ন যে কি জিনিস—তা আমি এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে গিয়ে সেই স্নেহ-যত্ন পেয়েছিলাম। তৃতীয় দিন রাত্রে আমার খুব কেঁপে জ্বর এল। সন্ধ্যা থেকেই একটু একটু জ্বরভাব বোধ করছিলাম; তার উপরই খেয়েছিলাম। মার কাছে তো না খাবার জো ছিল না! রাত্রে যখন শুলাম তখন খুব কেঁপে জ্বর। যত রাত বাড়তে লাগল জ্বরও তত বেশী হতে লাগল। সারা রাত এক রকম বেহুঁস হয়ে পড়েছিলাম। শেষ রাত্রে শশী মহারাজকে ধীরে ধীরে ডেকে বল্লাম—‘ভাই আর নয়। এখানে জ্বর নিয়ে থাকলে খালি মাকে কষ্ট দেওয়া হবে। কাল সকালেই মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। তারপর যা হবার হবে।’ শশী মহারাজও তাতে রাজী হলেন। ভোর হতেই আমরা তিন জন মাকে প্রণাম করে রওনা হলাম। এত শীঘ্র শীঘ্র চলে আসছিলাম বলে মা প্রথমটায় খুব আপত্তি করেছিলেন। শেষে আমাদের ঝোঁক দেখে আর কিছু

বল্লেন না। মায়ের বাড়ী থেকে বেরিয়ে অতি কষ্টে খানিক দূর এসে রাস্তায় একটী খালি গরুর গাড়ী দেখতে পেয়ে ঐ গাড়ী আরামবাগ পর্যন্ত ভাড়া করে তিন জনেই গাড়ীতে উঠে পড়লাম। গাড়ীতে উঠে আমি তো এক রকম বেহুঁস হয়ে পড়েছিলাম। দুপুরে এক গ্রামের কাছে গাড়ী দাঁড় করিয়ে একটু গরম জলের যোগাড় করা গেল। সে গ্রামের এক জন লোক আমার ঐ রকম জ্বর দেখে বল্লে, বেল পাতার রস খেলে জ্বর তখনই ছেড়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে তো কোন ওষুধ পত্র ছিল না; অগত্যা বেল পাতার রস খেতেই রাজী হলাম। ঐ লোকটী খানিকটা বেল পাতার রস করে নিয়ে এল ও গরম জল দিয়ে তাই খাইয়ে দিল। শশী মহারাজরা ঐ গ্রামের দোকান থেকে সামান্য কিছু মুড়ি মুড়কি কিনে জলযোগ করে নিলেন। পরে গাড়ী ছেড়ে দিল। আমার জ্বর সমভাবেই চলছে। ঐ জ্বর গায়ে আরামবাগে এসে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করান গেল। ডাক্তার দেখে বল্লে—ম্যালেরিয়া। আমি তো শুনে অবাক্! ম্যালেরিয়া কোত্থেকে হবে? আমার তো দশ পনর বৎসর কোন জ্বরই হয় নি। অবশ্য ছেলেবেলায় ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগেছিলাম। কিন্তু আমি তো ঠাকুরের কাছে আসার বহু বৎসর পূর্ব্ব থেকেই এক রকম বারাসত ছাড়া। একবার খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগি। তখন আমার বয়স চৌদ্দ পনর বৎসর। একটু সেরেই পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে চলে যাই এবং অনেক দিন পশ্চিমেই কাটাই। তারপরেও বড় একটা বারাসতে যেতাম না, বিশেষ ম্যালেরিয়ার সময়। তাই আরামবাগে ডাক্তার যখন বল্লে যে, ম্যালেরিয়া

তখন শেষটায় ঠিক হল, ঐ যে জয়রামবাটীতে তালপুকুরে খুব নেয়েছিলাম তাতেই নাকি সেই বহু বৎসরের পুরাণো ম্যালেরিয়ার বীজ আবার জেগে উঠেছিল। যাই হোক আরামবাগে দিন কতক থেকে সুস্থ হয়ে তারপর কল্‌কাতায় ফিরে এলাম।”

বেলুড় মঠ

৯ই আগষ্ট, ১৯২৯

আজ স্বামী — “মান্দ্রাজে ফিরে যাবেন। তাই তিনি সকালে এসে প্রণাম করতেই মহাপুরুষজী সস্নেহে বল্লেন—“আজ তো য— চলল। এবার অনেক দিন মঠে ছিল ঠাকুরের স্থানে। তা যাও। তোমরা প্রভুর ভক্ত, যেখানেই যাবে ঠাকুর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। তাঁর ভক্তেরা যে যেখানে আছে তিনিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।” অন্য সময় স্বামী —র সঙ্গে মঠ ও মিশন সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা হতে হতে ক্রমে ঠাকুরের সঙ্ঘশক্তির সম্বন্ধে মহাপুরুষজী বলেছিলেন—“সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্”, সত্যের জয় চিরকাল হয়ে আসছে, হবেও বাবা। এসব ঐশী শক্তির খেলা। ঠাকুর স্থূল শরীর পরিত্যাগ করে এখন এই সঙ্ঘের ভেতরে রয়েছেন। এখন ঠাকুর আছেন সঙ্ঘরূপে— এ হল স্বামিজীর কথা। এই যে তোমরা সব ভক্তেরা দূর দূর কেন্দ্র হতে এসে একত্রিত হয়েছ, এর ফল অতি শুভ হবে। ঠাকুর এখনও যে সঙ্ঘকে রক্ষা করছেন এবং ভবিষ্যতে যে করবেন, তা কখনও বা একটু নাড়াচাড়া

দিয়ে তিনি জানিয়ে দেন। স্বামিজী নিজে ঠাকুরের নির্দেশ মত এই সঙ্ঘের সংগঠন করেছেন; আর তাঁর উদার ধর্মভাব সমগ্র জগতে প্রচারের বিরাট দায়িত্ব এ সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত করে গেছেন। কেউ এই সঙ্ঘের অনিষ্ট করতে পারবে না, নিশ্চিত জেনো। যদি কেউ কখনও অন্য রকম মতলব নিয়েও আসে, তা হলে ঠাকুর তাদের মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন, সকলকে তিনি বুঝিয়ে দেবেন—এমন কি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলেও। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ তো ভুল করবেই, কিন্তু তিনি সকলকেই কৃপা করেন। পাপী, তাপী কেউ তাঁর কৃপা হতে বঞ্চিত হয় না। স্বামিজী বলেছেন না—'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ' ইত্যাদি? তিনি সকলকেই ক্ষমা করেন। আচণ্ডালে কৃপা করার জন্যই তো তিনি এই রামকৃষ্ণরূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তোমরা তো পড়েছ যীশুখৃষ্টের কথা। যারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছিল তাদের জন্যই তিনি পরম পিতার নিকট কাতর প্রাণে ক্ষমাভিক্ষা চেয়েছিলেন—'প্রভু, এদের ক্ষমা কর। এরা কি অন্যায় করছে তা এরা জানে না।' সেই পরব্রহ্মই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে এসেছেন। আমরা তো স্বচক্ষে দেখেছি তাঁর কী অসীম ক্ষমা, কি অদ্ভুত ক্ষমা! আর মা, তাঁর তো তুলনাই হয় না—সাক্ষাৎ জগদম্বা! এমনও শুনেছি, একজন এসে মায়ের কাছে এক ছেলের নামে বলেছিল যে, সে অশ্রাব্য ও মহাঘৃণ্য অপরাধ করেছে। মা খুব গম্ভীরভাবে সব শুনলেন। তারপরে ঐ লোকটী মাকে অনুরোধ করে বলল—'আপনি যদি তাকে ডেকে একটু বলে

দেন, তা হলে ভাল হয়।' তাতে মা বলেছিলেন—'বাবা, তোমরা ওরকম বলতে পার; কিন্তু আমি যে মা! আমার কাছে সকলেই সমান। সে তোমাদের কাছে মহা অপরাধী ও ঘৃণ্য হতে পারে; কিন্তু তার মার কাছে নয়। আমি মা হয়ে কি করে ছেলেকে ঘৃণা করব?' এমন ক্ষমা ছিল মায়ের! এসব তো আমাদের চোখের উপরেই সব হয়ে গেছে। আমরাও ঐ শিখেছি। ঠাকুর, মা, স্বামিজী এঁদের জীবন দেখেই তো আমাদের শিখতে হবে।" বলতে বলতে মহাপুরুষজীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হয়ে এল; তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আপন মনে গান ধরলেন।

"গাওয়ে জগপতি জগ-বন্দন, ব্রহ্ম সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভব-নায়ক ॥
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা বিত্ত-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা।
যাচে চরণ ভকত করযোড়ে, বিতর প্রেম-সুধা চিত্ত-চকোরে ॥"

বেলুড় মঠ

১লা নবেম্বর, ১৯২৯

গতরাত্রে মঠে খুব সমারোহের সহিত ৺কালীপূজা হয়ে গেছে। সারারাত্রি পূজা, পাঠ, ভজন কীর্তনে সমগ্র মঠ মুখরিত হয়েছিল। কলিকাতা হতেও অনেক সাধু ও ভক্ত মঠে পূজার আনন্দোৎসবে যোগদান করেছিলেন। রাত্রি সাড়ে নয়টায় মায়ের পূজা আরম্ভ হয়ে শেষ হয়েছিল ভোর পৌনে ছয়টায়। পূজান্তে ঐ হোমাগ্নিতে সপ্তশতী হোমও করা হয়েছিল।

সারারাত মহাপুরুষজীও পূজার আনন্দে ভরপুর হয়ে রয়েছিলেন। রাত্রে বহুবার সেবকদের পাঠিয়ে ৺পূজার সব খবরাদি নিয়েছিলেন। কালীকীর্তন যখন হচ্ছিল, তখন তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গাইছিলেন। যখন—“গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী-কাঞ্চী কেবা চায়। কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়” ইত্যাদি গানটি গাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি বললেন—“আহা, এ গানটি ঠাকুর খুব গাইতেন।” তিনিও সমস্ত গানটি সঙ্গে সঙ্গে গাইলেন।

সকাল বেলা মহাপুরুষজী নিজ প্রকোষ্ঠে বসে আছেন। সাধু ও ভক্তগণ একে একে তাঁকে প্রণাম করবার জন্য তাঁর ঘরে সমবেত। গতরাত্রির পূজার আনন্দে তখনও তিনি মাতোয়ারা। প্রতি কথায়, প্রত্যেক ব্যাপারে হৃদয়ের সেই আনন্দের অভিব্যক্তি হচ্ছিল। খানিক পরে তাঁর জন্য মায়ের পূজার প্রসাদাদি আনা হল। প্রসাদ দেখে ভারি আনন্দ। হাসতে হাসতে বললেন—“এ সব তো আমার কিছুই চলবে না। দৃষ্টিভোগ করাই সার।” বলে প্রত্যেক জিনিসই এক একবার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করে প্রথমটায় মস্তকে ও পরে জিহ্বায় ঠেকিয়ে বলতে লাগলেন—“বাঃ, বেশ হয়েছে। মায়ের চমৎকার ভোগ হয়েছে।” সেবক প্রসাদের থালা তাঁর সামনে থেকে নিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় বল্লেন—“দেখ, মহাপ্রসাদের বাটিটা কুকুরদের জন্য রেখে দেবে। ওদের তো আর কেউ দেবে না? আহা! ওরাও আশা করে আছে। কত আনন্দ করে খাবে।” এই বলেই ‘কেলো কেলো’ বলে ডাকতে লাগলেন।

গতরাত্রির পূজার কথা উঠতেই তিনি বল্লেন—“আহা!

এখনও সমগ্র মঠ যেন হোমের গন্ধে ভরপূর হয়ে আছে। হোমের গন্ধ যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত সব পবিত্র হয়ে যায়। আঃ কি মিষ্টি গন্ধ।" এই বলে নিজে নাক দিয়ে সেই গন্ধ টানতে লাগলেন।

জনৈক সন্ন্যাসী পূজার প্রসঙ্গে বল্লেন—"মহারাজ, কাল খুবই আনন্দ হয়েছিল। এমন আনন্দ বহুদিন হয় নি। ভজনও খুব জমেছিল, রাত প্রায় তিনটে পর্যন্ত।"

মহাপুরুষজী—"তা হবে না? মার পূজা হয়েছে! মা কৃপা করে সকলকে খুবই আনন্দ দিয়েছেন। মা সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হয়ে পূজা গ্রহণ করেছেন। আর এ মা তো যে সে মা নন, এ যে ঠাকুরের 'মা'। ঠাকুর নিজে মা কালীকে পূজা করেছিলেন। বেদে যাঁকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বলা হয়েছে, দ্বৈতবাদীরা যাঁকে ঈশ্বর বলে, শাক্তেরা যাঁকে শক্তি বলে, বৈষ্ণবদের যিনি বিষ্ণু, শৈবদের যিনি শিব তাঁকেই ঠাকুর মা বলতেন। আর সেই মাকে পূজা করেই ঠাকুরের সব রকমের অনুভূতি হয়েছিল। তিনি অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদি সব ভাবেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আর এখানকার মত পূজা আর কোথাও হয় না। এখানে সাধুভক্তদের ভক্তির পূজা। যাদের টাকা আছে তারা নানা ঘটা করে হাজার হাজার টাকা খরচ করে পূজা করতে পারে। কিন্তু এমন ভক্তিভাবে পূজা কোথাও হয় না। শুদ্ধসত্ত্ব সাধুব্রহ্মচারীরা সকলে প্রাণ দিয়ে পূজা করেছে—কত আন্তরিকতা, কত শ্রদ্ধাসহকারে। মার তাতে বড়ই প্রীতি। অধিকাংশ লোকেই তো নানা কামনা করে পূজা করে; নিষ্কাম

পূজো, ভক্তির পূজো আর কয়জনে করে? এখানে কারও কোন কামনা নেই, কোন বাসনা নেই, শুধু মায়ের প্রীতির জন্যই এই পূজো। সঙ্গে সঙ্গে কত জপ, ধ্যান, পাঠ, ভজন এসব হয়েছে, আর সব শুদ্ধসাত্ত্বিক, পবিত্র সাধুব্রহ্মচারীরা নিজেরা মার পূজোর আয়োজন করেছে। এমনটি বাবা, কোথাও হয় না। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর সাত্ত্বিক পূজো জগতে বিরল।”

বেলা প্রায় দশটা। একজন স্ত্রী-ভক্ত এসেছেন। তিনি মহা-পুরুষজীর নিকট কৃপাপ্রাপ্ত। তাঁর চরণে ভক্তিভরে প্রণত হয়ে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে তিনি বল্লেন—“না মা, শরীর ভাল নেই। খুবই খরাপ। দিন দিন আরও খারাপের দিকেই যাবে। শরীরের তো একটা ধর্ম আছে? এ দেহের বয়সও তো কম হল না? এখন ধীরে ধীরে এ দেহের নাশ হবে।”

স্ত্রী-ভক্তটি সজলনয়নে বল্লেন—“বাবা, আপনি চলে গেলে আমরা কার কাছে যাব? আমাদের প্রাণ জুড়াবার স্থান আর কোথায়?”

মহাপুরুষজী—“কেন মা! ঠাকুর আছেন। তিনি তো তোমার ভেতরেই রয়েছেন। তিনি যে তোমার অন্তরাত্মা—সকলেরই প্রাণের প্রাণ। তাঁকে আশ্রয় কর, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমার প্রাণে শান্তি দেবেন, তোমার প্রাণের সব অভাব পূর্ণ করে দেবেন। দেহের নাশ তো একদিন হবেই। কোন দেহই চিরকাল থাকে না। পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশে যাবে নিশ্চয়। অতএব যিনি চিরসত্য, নিত্য, অপরিণামী, সর্ব-ভূতের চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবান্, তাঁকেই আশ্রয় কর, তাঁকেই ধরে

থাক। তাহলে এ দুস্তর সংসার-সমুদ্রে আর কোন ভয় থাকবে না—অনায়াসে পার হয়ে যাবে।”

স্ত্রী-ভক্ত—“বাবা, আপনি আমার গুরু; আপনিই আমায় কৃপা করেছেন। আমাদের মনে কত রকম প্রশ্ন, কত সন্দেহ, কত নৈরাশ্য আসে। সে সব কে মেটাবে? এই তো আপনার চরণ-প্রান্তে এসেছি—এখন প্রাণে কত শান্তি, কত আনন্দ। কিন্তু আপনি চলে গেলে যে কি হবে তা ভাবতে প্রাণ কেঁদে ওঠে।”

মহাপুরুষজী—“দেখ মা, তোমায় সব কথা বলে দিয়েছি, গুরু একমাত্র ভগবান্। তিনিই জগদ্গুরু। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান জীবকে উদ্ধার করবার জন্য নরদেহ ধারণ করে রামকৃষ্ণরূপে এসেছিলেন। আমাদেরও তিনি সঙ্গে করে এনেছেন। ঠাকুর পঞ্চাশ বৎসরকাল নরদেহে অবস্থান করে বহুলোককে বহুভাবে কৃপা করে এক অলৌকিক জীবনাদর্শ সমগ্র জগতের সামনে রেখে গেছেন। তাঁর জীবনের সার উপদেশ—যা সমগ্র জীবনব্যাপী দেখিয়ে গেছেন তা হল—জগৎ অসত্য, অনিত্য; একমাত্র ভগবানই সত্য, নিত্য। এখন তিনি সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্মভাবে জগতের হিত-সাধন করছেন। ভগবদ্ভক্তেরা এখনও ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি তাঁদের দর্শন দেন, নানাভাবে কৃপা করেন। আমাদের তিনি এখনও স্থূলদেহে রেখেছেন। এ দেহ নষ্ট হয়ে গেলে আমরাও চিন্ময় দেহে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে অবস্থান করব। আমরা যাদের আশ্রয় দিয়েছি তাদের ইহকাল ও পরকালের সব ভার আমাদের নিতে হয়েছে। ভক্তেরা পবিত্রহৃদয়ে ব্যাকুলভাবে ডাকলে আমাদের দেখাও পাবে—যেমন এখন দেখতে

পাচ্ছ তার চাইতে আরও জীবন্ত ও স্পষ্টভাবে। অতএব মা, এখন হতে অন্তরে দেখবার চেষ্টা কর। বাইরের দেখাশুনা আর কদিনের?"

স্ত্রী-ভক্ত—"তাই আশীর্বাদ করুন বাবা, যাতে আপনাকে অন্তরে বাইরে সর্বত্র দর্শন করতে পারি।"

মহাপুরুষজী—"তা পাবে। খুব ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ডাকলেই দেখতে পাবে। তবে খুব ব্যাকুলতা না হলে হবে না।"

স্ত্রী-ভক্ত—"বাবা, আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। শাস্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মচর্য পালন না করলে ভগবান লাভ হয় না। ব্রহ্মচর্য পালন ব্যতিরেকে চিত্ত শুদ্ধ হয় না। এখন সেই ব্রহ্মচর্য কিভাবে পালন করতে হবে, তা আপনি দয়া করে বলে দিন। খাওয়া দাওয়ায় খুব কঠোরতা করব কি?"

মহাপুরুষজী—"না মা, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম কিছুই করতে হবে না। তবে ওরি মধ্যে একটু দেখেশুনে খেলেই হল। নেহাৎ যে সব জিনিস খুব উত্তেজক, তা নাই বা খেলে। কেবল মাত্র রসনার তৃপ্তি সাধনই তো আহারের উদ্দেশ্য নয়। শরীর ধারণের জন্য আহার। আবার শরীর ধারণের উদ্দেশ্য হল ভগবান লাভ। যে সকল খাবার মনকে চঞ্চল করে, মনকে ভগবন্মুখী হতে দেয় না, সে সকল খাবার না খাওয়াই ভাল। কেবলমাত্র আহারের সংযম করলেই যে ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়ে গেল তাও নয়। আসল ব্রহ্মচর্য হল ইন্দ্রিয়সংযম। তা না করতে পারলে ভগবদানন্দ লাভ করা

সুদূর পরাহত। তুচ্ছ রক্তমাংসের তৈরী দেহের আনন্দ না ছাড়তে পারলে সেই ব্রহ্মানন্দলাভ কি কখনও সম্ভব? তোমরা সংসার আশ্রমে রয়েছ। ঠাকুর সংসারীদের জন্য ভগবান লাভ করার পন্থা কত সোজা করে গেছেন। ঠাকুর বলতেন যে দুএকটী সন্তান হবার পর স্বামী-স্ত্রীতে ভাইবোনের মত থাকবে, দেহের সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে পরস্পরে ভগবদ্‌প্রসঙ্গ করবে, দুই জনেই যেন ভগবানের সেবক। দেহের সুখভোগের জন্য তো আর জীবন নয়? ভগবান লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম যখন পেয়েছ, তখন জীবনটা বৃথায় যেতে দিও না। আত্মস্বরূপ উপলব্ধি কর। ঠাকুরই হলেন তোমার আত্মা; তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। তিনি তো চৌদ্দপোয়া মানুষটা নন? তিনি স্বয়ং ভগবান, তিনিই জীবের অন্তরাত্মা। তাঁকে লাভ করলে ভববন্ধন চিরতরে কেটে যাবে, আর এ সংসারে বারবার যাতায়াত করতে হবে না। গীতায় আছে — 'যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।' সেই পরম পুরুষকে লাভ কর, তবেই জনম-মরণ-প্রহেলিকা চিরতরে ঘুচে যাবে মা, পরম গতি লাভ করতে পারবে। তাঁকে পেলেই সব বাসনা-কামনার নিবৃত্তি হয়, মানুষ পূর্ণ হয়ে যায়, আত্মস্বরূপ হয়ে যায়। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।'"

স্ত্রী-ভক্ত - "কি করে তাঁকে লাভ করতে পারব?"

মহাপুরুষজী "মা, ঠাকুর বলতেন যে, তিন টান এক হলে ভগবানের দর্শন হয়। সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর কৃপণের ধনের উপর টান। এই

তিন টান যদি এক করে ভগবানকে ডাকা যায় তা হলেই তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁর নাম কর, তাঁকে ধ্যান কর, আর খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর—'প্রভু, দেখা দাও, দেখা দাও'। কাঁদ, কাঁদ খুব কাঁদ। তবেই তিনি কৃপা করে দেখা দেবেন। তিনি যে বড় আশ্রিতবৎসল! যাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাকে কখনও ত্যাগ করেন না।"

বেলুড় মঠ

শনিবার, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৯

সকালবেলা। মঠের জনৈক সন্ন্যাসী এ প্রচণ্ড শীতে কাশ্মীর গিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে মহাপুরুষজী বল্লেন—"পে— এই শীতে কাশ্মীর গিয়েছে! হৃষীকেশ থেকে নাকি হেঁটে গেছে। এ খবরটা শুনে অবধি মনটা খুবই খারাপ হয়েছে। আহা! ঠাকুর রক্ষা কর, তোমারই আশ্রিত। আমার মনে হচ্ছে যে, ওর মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে; নইলে এমন বুদ্ধি হবে কেন? এ সময় কি কেউ কাশ্মীর যায়? (খানিক চুপ করে থেকে) বাবা! এ বড় কঠিন পথ! এ ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাপার বড় শক্ত। সব মাথা এ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস ধারণাই করতে পারে না। জাগতিক বিদ্যা শেখা সোজা; বড় দার্শনিক হওয়া কি বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া, বড় কবি, কি চিত্রকর, কি বড় রাজনীতিজ্ঞ হওয়া—এ বরং সোজা; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা মহা কঠিন ব্যাপার। তাই তো উপনিষদ্‌কার বলেছেন—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা

দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'* এ পথ যে কত দুর্গম তা যারা এ মার্গে আসে নি তারা ধারণাই করতে পারে না। উপনিষদে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে—যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তাকে—পরাবিদ্যা বলা হয়েছে: আর যাবতীয় জাগতিক বিদ্যাকে বলেছে অপরা বিদ্যা। এ পরাবিদ্যা লাভ করতে হলে অটুট ব্রহ্মচর্যের দরকার। কায়মনোবাক্যে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য পালনের ফলে শরীর ও মনে শুদ্ধ, পবিত্র ভগবদ্ভাব—ব্রহ্মভাব ধারণা করবার মত শক্তি জন্মায়, মস্তিষ্কে নূতন স্নায়ুর সৃষ্টি হয়, শরীরের ভেতরকার সব অণুপরমাণু পর্যন্ত বদলে যায়। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য চাই। ঠাকুর বলতেন যে, দইপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়, পাছে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। তাই তো তিনি শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেদের অত ভালবাসতেন। তারাই ভগবদ্ভাব ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারে। এসব অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার। অবশ্য সর্বোপরি চাই ভগবৎ কৃপা। মহামায়ার বিশেষ কৃপা না হলে এসব কিছুই হবার জো নেই। তিনি কৃপা করে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বার খুলে দিলে তবেই জীব ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হতে পারে, নচেৎ নয়। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে', সেই মহামায়াই প্রসন্না হয়ে মানবগণকে মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন। মস্তিষ্কের ভেতর কত কি সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে। তার একটু কিছু বিগড়ে গেলেই হয়ে গেল। মা ঠাকরুণ বলতেন—'ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে যাতে মাথাটা ঠিক

* জ্ঞানীরা বলেন যে, ক্ষুরের ধারাল ফলার উপর দিয়ে চলা যেমন সুকঠিন, ব্রহ্মজ্ঞানের পথ তেমনি দুর্গম।

থাকে।' মাথাটী বিগড়ে গেলেই বাস্—সব হয়ে গেল। স্বামিজী বলেছিলেন—'Shoot me if my brain goes wrong' —(আমার মাথা যদি বিগড়ে যায় তো আমায় গুলি করে মেরে ফেলো)। পে—যখন প্রথম মঠে আসে তখন ওর মাথার গড়ন দেখেই আমার মনে হয়েছিল যে ওর মাথা বিগড়ে যাবে—ও পাগল হয়ে যাবে। শুনেছিলাম যে হৃষীকেশে নাকি কোন হঠযোগীর কাছে হঠযোগ শিখছিল। ও সব, বাবা, ভাল নয়। তা ছাড়া ও বহুদিন যাবৎ খালি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, মঠের সাধুদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখে নি —যা খুশী তাই করে বেড়িয়েছে। এখন দেখ তো মাথাটী বিগড়ে বসেছে। মহারাজও বলতেন যে, প্রথমাবস্থায় সাধুর পক্ষে একেবারে একা একা থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। অন্ততঃ দুজন একসঙ্গে থাকা ভাল। আর ঐ করে বুঝি তপস্যা হয়? খালি হৃষীকেশ উত্তরকাশী আর পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেই তপস্যা হল?" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—"ঠাকুর, রক্ষা কর, তোমারই আশ্রয়ে এসেছে। তুমি না বাঁচালে আর কে বাঁচাবে? আহা! বেচারী বড় ভাল ছেলে ছিল।"

জনৈক ব্রহ্মচারী—"ভাগবতে উদ্ধব-গীতায় আছে যে, সাধকের সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। দেব, গ্রহাদি, ব্যাধি, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি নানা ভাবে এসে সাধনের ঘোরতর বিঘ্ন উৎপাদন করে।"

মহাপুরুষজী—"শ্রীভগবানের কৃপা হলে সব বিঘ্নই কেটে যায়; ঠাকুর হলেন কপালমোচন, তাঁর আশ্রয় নিলে আধিভৌতিক,

আধিদৈবিক ইত্যাদি সব বিঘ্ন অপসারিত হয়ে যায়। চণ্ডীতে আছে—'রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।

ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥

অর্থাৎ সেই মহামায়া প্রসন্না হলে অশেষ রোগের নাশ হয়ে যায়; আবার তিনি রুষ্টা হলে সকল বাঞ্ছিত কামনা নষ্ট হয়, তাঁর আশ্রিতগণের বিপদ থাকে না—তারা সকল প্রকার বিপন্মুক্ত হয়ে যায়; আর তাঁর আশ্রিত ও কৃপাপ্রাপ্ত মনুষ্যগণ সর্বজীবের আশ্রয়স্থল হয়—তারা ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে সকলের অধিষ্ঠানস্বরূপ হয়। আর আছে সৎসঙ্গ—তাতে মানুষ রক্ষা পায়। 'সতাং সঙ্গ'—মহতের সঙ্গ বিশেষ দরকার। হাজার হাজার লোক চেষ্টা করে; কিন্তু দু এক জনের মাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। মহারাজকে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিল—'ভক্তি কিসে হয়?' তাতে মহারাজ বারংবার বলেছিলেন—'সৎসঙ্গ সৎসঙ্গ।' মহাপুরুষরা ভগবানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সৎসঙ্গ চাই বাবা, সৎসঙ্গ চাই। সমস্ত শাস্ত্রাদিতেই সৎসঙ্গের খুব প্রশংসা আছে।"

ব্রহ্মচারী—'রামায়ণে আছে—'ঋষীণামগ্নিকল্পানাং ইত্যাদি।'

মহাপুরুষজী—"ঠিক বলেছ। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অগ্নিকল্প ঋষিদের আশীর্বাদ ও বরলাভ করে রাক্ষসকুল ধ্বংসের উদ্যোগ করেছিলেন।" পরে 'সতাং সঙ্গ' বারবার বললেন। শেষটায় বল্লেন—"তবে কি জান? আর যাই হোক, মহামায়ার কৃপা না হলে কিছুই হবে না। তিনি প্রসন্না হয়ে তাঁর এলাকার বাইরে যেতে দিলেই রক্ষা। নইলে আর কোন উপায় নেই। কৃপা, কৃপা, কৃপা! আন্তরিক হলে তিনি কৃপা করেনও।"

বেলুড় মঠ

রবিবার, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৯

সকাল বেলা। মঠের অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মহাপুরুষজীর ঘরে সমবেত হয়েছেন। সাধনভজন সম্বন্ধে কথাবার্তা চলেছে।

মহাপুরুষজী—"ভগবানের নাম, তাঁর ভজন করতে করতে সংযম আপনা হতেই আসবে। তাঁর নামের এমনই শক্তি যে, তাতে অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয় সবই সংযত হয়ে যায়। তবে খুব প্রেমের সঙ্গে নাম করতে হবে। কোন রকমে তাঁর উপর যদি ভালবাসা এসে গেল—বাস্। তার আর কোন ভাবনা নেই—খুব শীঘ্র শীঘ্র তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। তাঁর উপর আপনার বোধ এসে গেলেই নিশ্চিন্তি! কিন্তু যতদিন মন নিম্নভূমিতে থাকে, ততদিন ভগবানের উপর ঠিক ঠিক ভালবাসা আসা সম্ভব নয়। খুব ভজনসাধন, তাঁর নাম করতে করতে যখন কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন এবং মন ক্রমে নীচের তিন ভূমি ছাড়িয়ে চতুর্থ ভূমিতে অবস্থান করে তখনই সাধকের ঈশ্বরীয় রূপাদি দর্শন হয় এবং ক্রমে তাঁর উপর ভালবাসা জন্মে। মন শুদ্ধ না হলে সেই 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' ভগবানে প্রেম কি করে হবে? সেই জন্য চাই খুব ভজনসাধন ব্যাকুলতা। তোমাদের হবে, খুব শীঘ্র শীঘ্রই হবে; কারণ তোমরা সব আকুমার ব্রহ্মচারী, কাম-কাঞ্চনের দাগটি পর্যন্ত মনে লাগে নি, সব অতি পবিত্র আধার। শুদ্ধ আধারে তাঁর প্রকাশ শীঘ্র শীঘ্র হয়। একটু জোর করে

খেটেই দেখ না, হয় কি না। সাধনভজনই মুখ্য জিনিস জ্ঞান করবে; বাকী যত কাজকর্ম—বক্তৃতা ক্লাস এ সব জানবে যে গৌণ। একই স্থানে, একই আসনে বসে জপধ্যান করা ভাল; তাতে একটা atmosphere (পরিবেষ্টনী) সৃষ্টি হয়ে যায় এবং শীঘ্র মন স্থির হবার সাহায্য করে। আর মাতৃজাতি দেখলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে মনে প্রণাম করবে। আমাদের প্রতি ঠাকুরের বিশেষ শিক্ষাই ছিল তাই এবং তিনি নিজের জীবনেও করে গেছেন। সন্ন্যাসীর জীবন যেন নির্জলা একাদশী। একটুও মালিন্য থাকবে না—নিষ্কলঙ্ক জীবন হওয়া চাই। মনে কাম-কাঞ্চনের এতটুকু রেখাপাতও হতে দেবে না। সর্বক্ষণ উচ্চ-চিন্তা, ভগবদ্‌ধ্যান, ভজন, পাঠ, প্রার্থনা এই সব নিয়ে থাকতে হবে। তোমাদের হল আধ্যাত্মিক জীবন, দিব্য জীবন। ঠাকুর বলতেন—'মৌমাছি ফুলেই বসে—মধুই পান করে।' প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন মৌমাছির মত হবে। ভগবদানন্দই সে সম্ভোগ করবে, অন্য কোন দিকে মনকে যেতে দেবে না। তোমরা যুগাবতারের লীলা পুষ্ট করবার জন্য তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে আশ্রয় নিয়েছ। সমগ্র পৃথিবী চেয়ে আছে তৃষিতনয়নে তোমাদের দিকে, ঠাকুরের ভাব পাবার জন্য। আমাদের পার্থিব জীবন তো শেষ হয়ে এল। এখন সে স্থান পূরণ করতে হবে তোমাদের। কত বড় দায়িত্ব তোমাদের উপর—একবার ভেবে দেখ তো? সব শক্তির আধার তো তিনি। যেমন যেমন প্রয়োজন হবে তোমাদের ভেতর তিনি শক্তিসঞ্চার করে দেবেন—তোমাদেরও তাঁর বাণী, তাঁর ভাব প্রচার করবার অধিকারী করবেন। যত তাঁকে হৃদয়ে

প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ততই বুঝতে পারবে যে, তিনি অন্তরে বসে সূক্ষ্মভাবে তোমাদের হাত ধরে রয়েছেন। তিনি যে ভগবান আর তোমরা যে তাঁরই আশ্রিত! তিনি জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা—সব দেবেন, জীবন মধুময় করে দেবেন।"

পরে ঠাকুরের অবতারত্ব ও জীবের দুঃখমোচনের জন্য দেহ-ধারণ সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজ, অবতার পুরুষদের পূর্ণজ্ঞান বরাবর থাকে কি?"

মহাপুরুষজী—"তা থাকে বই কি! এই দেখ না শ্রীকৃষ্ণের জীবনে—জন্ম থেকেই তিনি যে ভগবান সে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য সব অবতারে ঐ সকল ভাবের অভিব্যক্তি এক রকম হয় না। কিন্তু তাঁদের সেই বিষয়ে জ্ঞান পুরাপুরি থাকে। জগতের আধ্যাত্মিক কল্যাণ করবার জন্যই তো ভগবানের শক্তির আবির্ভাব—ওঁদের সবটাই দয়ার ব্যাপার। অবতার তো আর সাধারণ জীবের ন্যায় কর্মফলে জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁদের আবার অজ্ঞান কোথায়? পূর্ণব্রহ্মসনাতন, মায়াধীশ, মায়াকে আশ্রয় করে জগতে অবতীর্ণ হন এবং যুগপ্রয়োজন সিদ্ধ করে আবার স্বস্বরূপে লীন হয়ে যান। তাঁদের সাধনভজন, কঠোর তপশ্চরণ—এ সবই লোকশিক্ষার জন্য—জগতের সামনে আদর্শ দেখাবার জন্য। তিনি তো ঈশ্বর, তিনি তো পূর্ণ; তাঁর আবার অপূর্ণত্ব কোথায়? গীতাতে ভগবান বলেছেন—

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥'

তাঁর কিছুই অপ্রাপ্ত নেই কারণ তিনি পূর্ণ; তবু লোক-শিক্ষার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হন। আবার বলেছেন—

'ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।'
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥'

তাঁর কর্মফলের কোন স্পৃহা নেই—আর কর্মসমুদয়ও তাঁকে লিপ্ত করতে পারে না। এ না হলে তাঁর ঈশ্বরত্ব—অবতারত্ব কোথায়? অবতারেরা যতদিন নরদেহ আশ্রয় করে জগতে অবস্থান করেন, ততদিন তাঁদের সব ব্যবহারাদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের মতই মনে হয়—সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। এ সব দেখে মনে হয় যে, তাঁদের পূর্ণজ্ঞান সব সময়ে থাকে না। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। বিশেষ করে ঠাকুরের জীবনে দেখা যায় যে, ঐশ্বর্যের বিকাশ আদৌ নেই—মানুষের দিক তাঁর জীবনে বেশী ব্যক্ত হয়েছিল। এবার শুদ্ধসত্ত্বভাবের অবতার। তাই তো তিনি বলেছিলেন—'এ যেন রাজা ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন।' ঠাকুরের এ ভাব বুঝা বড় কঠিন। দেখ না কেশববাবুর দেহত্যাগ হলে ঠাকুর খুবই কাঁদতে লাগলেন। আর বলেছিলেন—'কেশব দেহত্যাগ করেছে। আমার মনে হচ্ছে যে, একটা অঙ্গ খসে গেছে। এখন কল্‌কাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব?' ইত্যাদি। যেমন মানুষ আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে শোক করে, কাঁদে—ঠিক তেমনি। এই তো হল তাঁদের লীলা, এ ধারণা করা বড় শক্ত ব্যাপার। অধ্যাত্ম-রামায়ণে এই বিষয়ে বেশ চমৎকার কথা আছে—কেমন সুন্দর জ্ঞান-ভক্তির সামঞ্জস্য তাতে পাওয়া যায়। রামচন্দ্র স্বয়ং পরব্রহ্ম—

ত্রিকালজ্ঞ। রাবণের সঙ্গে সমস্ত রাক্ষসকুল ধ্বংস করে পুনরায় ধর্মসংস্থাপন করার জন্যই তিনি নরদেহ ধারণ করেছিলেন। রাবণ সীতাহরণ করবে তাও তিনি জানতেন। অধ্যাত্মরামায়ণেই রয়েছে যে, রাবণ ভিক্ষুক বেশে সীতাহরণ করতে আসার পূর্বেই রামচন্দ্র সীতাকে বলছেন—'হে জানকি! রাবণ ভিক্ষুকরূপে তোমাকে হরণ করতে আসবে, তুমি তোমার ছায়ামূর্তি কুটীরে স্থাপন করে অগ্নিতে প্রবেশ কর এবং তথায় অদৃশ্যরূপে এক বৎসরকাল অবস্থান কর। রাবণবধের পর পুনরায় আমার সঙ্গে মিলিত হবে।' এই বলে সীতাকে অগ্নিতে প্রবেশ করালেন। আবার ওদিকে সীতাহরণের পর কী শোক প্রকাশ! আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করে দিনরাত কাঁদছেন আর সীতাকে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন! বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী সকলকে বিলাপ করতে করতে সীতার খবর জিজ্ঞাসা করছেন! শোকে 'হায় হায়' করে সারা বন-জঙ্গল পাতি পাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন! এ সব অতি মজার ব্যাপার! তাঁরা সহজে ধরা দিতে চান না।"

বেলুড় মঠ

সোমবার, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৯

জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী প্রণামান্তর কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন। মহাপুরুষ মহারাজ হাসতে হাসতে পার্শ্বস্থ সেবককে দেখিয়ে বল্লেন, "শরীর কেমন আছে তা এদের জিজ্ঞাসা কর। আমি অত ভাবি নে। শরীর যে আছে তাই অনেক সময় মনে হয় না—মাইরি

বলছি। এই সকলে জিজ্ঞাসা করে, তাই তখন যা মনে আসে বলে দি। আমি জানি যে, আমার দেহ, মন, প্রাণ সবই তাঁর চরণে অর্পণ করে দিয়েছি—সবই তাঁর। এখন তিনি যেমন ইচ্ছা হয় করবেন। এ শরীর আরও রাখার প্রয়োজন বোধ করেন তো রাখবেন। নইলে যখনই ডাকবেন চলে যাব। আমি তো তাঁর আহ্বানের জন্য তৈরী হয়ে বসে আছি। তা বলে এ শরীরের কোন অযত্ন করি নে। তোমরা সকলে যেমন বল, ডাক্তার যেমন বলে, সেইভাবেই চলবার চেষ্টা করি। এ শরীরের জন্য (সেবকের দিকে তাকিয়ে) এদেরই বা কত কষ্ট দিচ্ছি। এতটা করি কেন জান? এ দেহ তো সাধারণ দেহের মত নয়? এর একটা বিশেষত্ব আছে। এ শরীরে ভগবান উপলব্ধি হয়েছে, এ শরীর ভগবানকে স্পর্শ করেছে, তাঁর সঙ্গে বাস করেছে, তাঁর সেবা করেছে। এই শরীরকে তিনি তাঁর যুগধর্ম প্রচারের যন্ত্রস্বরূপ করেছেন। তাই এত। নইলে খালি শরীরটা রক্তমাংসের খাঁচা বই তো নয়? তবে ঠাকুর আমায় তাঁর সেবাদি বড় একটা করতে দিতেন না। তাতে অনেক সময় আমার মনে কষ্ট হত। তিনি যে কেন অমন করতেন তা পরে একদিনকার ঘটনা থেকে বুঝতে পারলাম। তাঁর ভাব কে বুঝবে? একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে রয়েছি, আরও অনেক ভক্তও আছেন। তাঁর ঘরে বসে অনেক কথাবার্তা বলার পর তিনি ঝাউতলার দিকে শৌচাদিতে গেলেন। সাধারণতঃ তাঁকে শৌচে যেতে দেখলে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে কেউ একজন তাঁর গাড়ুটা নিয়ে যেত এবং শৌচাদির পরে তাঁর হাতে গাড়ু থেকে জল ঢেলে দিত। তিনি অনেক সময়ই

ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করতে পারতেন না। যাই হোক, সেদিন তাঁকে শৌচে যেতে দেখে আমিই গাড়ুটা নিয়ে ঝাউতলার দিকে গেলাম। তিনি শৌচাদি সেরে আমাকে গাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বল্লেন—"দেখ্, তুই কেন জলের গাড়ুটা আনলি? তোর জল আমি কেমন করে নেব? তোর সেবা কি আমি নিতে পারি? তোর বাবাকে যে আমি গুরুর মত শ্রদ্ধা করি। তাঁর কথা শুনে আমি তো অবাক্! তখন বুঝলাম যে, তিনি কেন তাঁর সব রকম সেবা আমায় করতে দিতেন না। অনন্ত ভাবময় ঠাকুর—তাঁর ভাব আমরা কি বুঝব? তিনি দয়া করে যতটুকু বোঝান ততটুকুই মানুষ বুঝতে পারে।"

পরে দীক্ষাদির কথা উঠল। তাতে মহাপুরুষজী বল্লেন—"না, দীক্ষা দিতে আমার কোনই কষ্ট হয় না, বরং আনন্দ হয়। ভক্তেরা আসে, তাদের ঠাকুরের নাম দিয়ে দিই, তাদের সঙ্গে ঠাকুরের প্রসঙ্গ করি। আমার দীক্ষাদিতে কোন ভটচার্জিগিরি নেই। অত তন্ত্রমন্ত্র আমি বিশেষ জানি নে, আর জানবার কোন প্রয়োজনও বোধ করি নে। ঠাকুরকে জানি—তিনিই সব! তাঁরই নাম, তাঁরই শক্তি। তাঁর ইচ্ছাতে তাঁরই নাম সকলকে দিই; আর প্রার্থনা করি, —'ঠাকুর তুমি এদের গ্রহণ কর; এদের ভক্তি বিশ্বাস দাও, দয়া কর' তা তিনি সকলের হৃদয়ে ভক্তি বিশ্বাস দেন। আমার ঠাকুরই সব।

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।'*

* হে দেবদেব, তুমি আমার মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা, তুমি বিদ্যা, তুমি ঐশ্বর্য, তুমিই আমার সব।

যে যেমন প্রার্থনা করে, তাকে তিনি তেমনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলই দিয়ে থাকেন। এইটুকু ঠাকুরের মাহাত্ম্য যে, তাঁর নাম নিয়ে শান্তি, তাঁর সেবা করে শান্তি, তাঁর চিন্তা করে শান্তি। তিনি যুগাবতার এই জন্যই এ সব হয়—এ সব হবেই। আর এমনি তাঁর আকর্ষণী শক্তি যে, আপনা হতেই লোক তাঁর দিকে আকৃষ্ট হবে—তা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন।"

বেলুড় মঠ

বুধবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৯

দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের কথায় মহাপুরুষ মহারাজ বল্লেন, "হাঁ, সিলোন্ গিয়েছিলাম বৈ কি! স্বামিজী ভারতবর্ষে ফিরে এসে কয়েক মাস পরে আমাকে সেখানে বেদান্ত প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন। আমি ৭।৮ মাস কলম্বোতে ছিলাম—এক সঙ্গে থাকতাম। নিয়মিতভাবে গীতাক্লাস ও ধর্মপ্রসঙ্গাদি করতাম; অনেক লোক আসত। বেশ ছিলাম। ওখানকার প্রসিদ্ধ মন্দিরাদি ও সব ঘুরে দেখেছি। বুদ্ধদেবের দন্তমন্দির—ওখানে নাকি বুদ্ধদেবের একটী দাঁত রাখা আছে। কি বিরাট কাণ্ডই না করেছে! মন্দির দেখলে তাক্ লেগে যায়। স্বামিজী যখন আমেরিকা থেকে মান্দ্রাজে এলেন, আমি তার আগে থেকেই মান্দ্রাজে গিয়েছিলাম স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে। আমি অবশ্য তার পূর্বেও একবার রামেশ্বরাদি তীর্থ দর্শন করতে ও অঞ্চলে গিয়েছিলাম এবং দক্ষিণ ভারতের প্রায় সব প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানাদি দর্শন করেছিলাম। ঐ সব বিরাট মন্দিরাদি দেখে

বেশ বোঝা যায় যে, ভারতবাসীরা কতটা ধর্মপ্রাণ। ভগবানকে নিয়েই যত কিছু লীলাখেলা—তাঁকেই নানাভাবে সম্ভোগ করার চেষ্টা। ভগবদ্ ভক্তেরা বহু ভাবে শ্রীভগবানকে সেবা করতে চান; তাতেই তাঁদের আনন্দ ও তৃপ্তি।"

সন্ন্যাসী—"সিলোন আপনার কেমন লেগেছিল, মহারাজ?"

মহাপুরুষজী—"আমার সব জায়গাই ভাল লাগে। কখনও কোন স্থানে অতৃপ্তি বোধ করি নি। যখন যেখানে থাকি, বেশ আনন্দেই থাকি। ভগবানকে নিয়ে থাকলে সব জায়গায়ই আনন্দ। হাঁ, সিলোন্ ও দক্ষিণ ভারত বেশ ভালই লেগেছিল।"

সন্ন্যাসী—"মহারাজ, ছেলেবেলায় আপনার নাম যে তারকনাথ রাখা হয়েছিল তার কোন বিশেষ কারণ ছিল কি?"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, শুনেছি যে, অনেক দিন ছেলেপিলে না হওয়ায় বাবা, মা ৺তারকেশ্বরের মানত করেছিলেন এবং একটী ছেলের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। বাবা ৺তারকনাথ মাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর এক সুপুত্র জন্মাবে। তার পরেই আমার জন্ম হয়েছিল বলে আমার নাম তারকনাথ রাখা হয়েছিল। গর্ভধারিণী মা,—তাঁর নাম ছিল বামাসুন্দরী—খুবই ধর্মপ্রাণা ও লক্ষ্মী ছিলেন; দেখতেও বেশ সুন্দরী ছিলেন। ছেলেবেলায় ধর্মভাব তাঁর কাছেই পেয়েছি। বাবাও খুব ধার্মিক ছিলেন। তাঁর আয়ও ছিল যথেষ্ট। পঁচিশ ত্রিশটী গরীব ছেলেকে বাবা নিজের বাড়িতে রেখে খাওয়াপরা দিতেন। বারাসত স্কুলে তারা সব পড়ত। আমিও তাদের সঙ্গেই থাকতাম। মা নিজের হাতে সকলকে রান্না করে খাওয়াতেন। বাবা রাঁধবার

বামুন রাখতে চাইলে মা রাখতে দিতেন না। তিনি বলতেন, 'এ তো আমার মহাভাগ্য যে, এতগুলি ছেলেকে রান্নাদি করে খাওয়াচ্ছি।' আমি মার কাছে আদর স্নেহ বড় একটা পাই নি। তিনি কাজকর্ম নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। সেই পঁচিশ ত্রিশটা ছেলের মধ্যে আমিও একজন। আমার জন্য আলাদা খাবার কিছু করতেন না; সকলের সঙ্গেই খেতাম। কেউ কেউ বলত—'ছেলেটাকে একটু আদর যত্ন কচ্ছে না।' তাতে মা বলতেন—'তাঁর ছেলে, আমার নয়। তিনি দয়া করে দিয়েছেন—তিনিই ওকে দেখবেন।' আমার বয়স যখন নয় বৎসর আন্দাজ, তখন মা মারা যান। মার সম্বন্ধে তেমন কিছুই মনে নেই। বাবা কানাই ঘোষাল খুব ধার্মিক ও গুণী আর খুব ভক্ত ছিলেন। রাত্রিতে—'মা একি করলি, আমায় এখনও কৃপা করলি নি'—এই সব বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদতেন।

মা-ই লক্ষ্মী ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার আয় কমে যেতে লাগল। তাঁর অনেক দান ধ্যান ছিল। কিন্তু আয় কমে যেতে আর আগের মত দানাদি করতে পারতেন না। আমি খুবই ভাগ্যবান যে, অমন বাপ মায়ের ঘরে জন্মেছিলাম। বাপ মা ভাল হলে ছেলেপিলে ভাল হয়। বাবার ত্যাগ যথেষ্ট ছিল। অত টাকা রোজগার করেছিলেন; কিন্তু নিজের থাকবার জন্য একটা ভাল বাড়িও করেন নি। সব টাকা গরীব দুঃখীদের সেবায় ব্যয় করে গিয়েছেন। বাবা তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাঁর কাছে কামাখ্যা থেকে একজন সাধক ভট্টাচার্য মশাই এসেছিলেন। তাঁর কী চেহারা! বেঁটে, লাল

টুক্‌টুকে। সারারাত দুজনে খুব পূজাদি করতেন। বাড়িতেই পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল। একবার পূজার সময় ঘট স্থাপন করে তাতে ডাব নারকেল দেওয়া হয়েছিল। সেই ডাব থেকেই প্রকাণ্ড নারকেল গাছ হয়ে গিয়েছিল—ছাদের সমান উঁচু।”

বেলুড় মঠ

বুধবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৯

কাল রাত্রে মঠে ‘ক্রীষ্টমাস ইভ্’ উৎসব খুব আনন্দ ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়ে গেছে। নীচের বৈঠকখানা ঘরে -‘মেরী কোলে যীশু’ এই ছবিখানি পত্র, পুষ্প ও মাল্যাদি দ্বারা অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করে নানাবিধ ফল মিষ্টান্ন ও কেক্ প্রভৃতি ভোগ নিবেদন করা হয়েছিল। মঠের সাধুব্রহ্মচারী ছাড়া অনেক ভক্তও ঐ উৎসবে যোগদান করেছিলেন। বাইবেল হতে যীশুর জন্ম ও উপদেশাদি পাঠান্তে কয়েকজন প্রবীণ সন্ন্যাসী যীশুর পবিত্র জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতাদি করেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজে নীচে গিয়ে ঐ উৎসবে যোগদান করতে পারেন নি; কিন্তু উৎসবের সব খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়েছিলেন এবং খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

সকাল বেলা মঠের সাধুব্রহ্মচারীরা মহাপুরুষজীর ঘরে সমবেত হতেই তিনি সকলকে হাসিমুখে ‘Happy Christmas’ (শুভ খৃষ্ট জন্ম-বাসর) বলে অভ্যর্থনা করতে লাগলেন এবং পূর্ব রাত্রে

'ক্রীষ্টমাস্ ইভ্' উৎসব সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বল্লেন—"এ উৎসব আমাদের হয়ে আসছে সেই বরাহনগর মঠ থেকেই। ঠাকুরের দেহ-ত্যাগের কয়েক মাস পরে বাবুরাম মহারাজের মা তাঁদের দেশ আঁটপুরে কিছুদিনের জন্য যেতে আমাদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। স্বামিজী সকলকে নিয়ে আঁটপুরে গেলেন। তখন আমাদের সকলেরই প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য; ঠাকুরের বিরহে সকলেরই মনপ্রাণ ছট্ফট করছে। সকলেই কঠোর সাধনভজনে রত। দিনরাত সর্বক্ষণ কি করে ভগবান লাভ হবে, কি করে প্রাণে শান্তি হবে, সেই ছিল একমাত্র চিন্তা। আঁটপুরে গিয়ে আমরা খুব ভজনসাধন চালিয়ে-ছিলাম। ধুনি জেলে সারারাত ধুনির পাশে বসে জপধ্যানে কাটিয়ে দিতাম। স্বামিজী আমাদের নিয়ে ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রসঙ্গাদি খুব করতেন। কখনও উপনিষদ্, কখনও গীতা, ভাগবত এ সব পড়াতেন ও আলোচনাদি করতেন। এইভাবে কিছু দিন কাটল। একরাত্রে আমরা সকলেই ধুনির পাশে বসে ধ্যান করছি; অনেকক্ষণ ধ্যান করার পরে হঠাৎ স্বামিজী যেন ভাবাবিষ্ট হয়ে যীশুখৃষ্টের জীবন সম্বন্ধে তন্ময় হয়ে বলতে আরম্ভ করলেন। যীশুর কঠোর সাধনা, জ্বলন্ত ত্যাগবৈরাগ্য, তাঁর উপদেশ—সর্বোপরি ভগবানের সঙ্গে তাঁর একত্ব অনুভূতি ইত্যাদি ঘটনা এমন তেজের সঙ্গে, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন যে, আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তখন মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং যীশুই স্বামিজীর মুখ দিয়ে তাঁর অলৌকিক জীবন-কাহিনী আমাদের শোনাচ্ছিলেন। এই সব শুনতে শুনতে আমাদের প্রাণে এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল; আর কেবলই মনে হচ্ছিল যে,

যেমন করেই হোক আগে ভগবান লাভ করতে হবে, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতে হবে—আর সবই বাজে। স্বামিজী যখন যে বিষয়ে বলতেন, একেবারে চূড়ান্ত করে বলতেন। পরে জানা গেল যে, ঐ দিনই ছিল 'ক্রীষ্টমাস্ ইভ্' অথচ আগে কেউই তা জানত না। আমাদের মনে হল যে, যীশুই যেন স্বামিজীর ভেতর আবির্ভূত হয়ে আমাদের ত্যাগবৈরাগ্যের ভাব এবং ভগবান-লাভের আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র করবার জন্য তাঁর সেই মহিমা-মণ্ডিত জীবনী ও উপদেশ আমাদের শুনিয়েছিলেন। আঁটপুরে থাকার সময়েই আমাদের সকলের ভেতর সন্ন্যাসী হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে থাকার সঙ্কল্প দৃঢ় হল। ঠাকুর তো আমাদের সন্ন্যাসী করে গিয়েছিলেনই; সেই ভাব আরও পাকা হল আঁটপুরে। যীশু ছিলেন সন্ন্যাসীর রাজা, ত্যাগের জ্বলন্তমূর্তি। আদর্শ সন্ন্যাসী না হলে তাঁর অত্যাশ্চর্য লোকাতীত জীবন ও অপরূপ উপদেশ বোঝা বড় কঠিন। আমরা ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গলাভ করেছি; তাই তাঁকে কিছু কিছু বুঝতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁকে কি করে বুঝবে? এমন কি যীশুখৃষ্টের দলের লোকেরাও তাঁকে যথার্থরূপে বুঝতে পারে নি—বিশেষ করে ইদানীন্তন খৃষ্টান পাদ্রীরা তো তাঁকে আদৌ বুঝতে পারে না, তাঁর জীবনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কোথায়, তা ধরতেই পারে না। কারণ, আজকালকার খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের অনেকের মধ্যেই সেই ত্যাগতপস্যা, বিবেকবৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্বের অভাব হয়ে পড়েছে। ভারতবাসীরা ধর্ম কি জিনিস তা বোঝে এবং কি করে ধর্মজীবন যাপন করতে হয় তাও জানে। সেই জন্যই

দেখ না ভারতবর্ষে এই গত দেড় শত বৎসর খৃষ্টধর্ম প্রচারের ফল কি হয়েছে? কিছুই নয়। কটা লোক তাদের প্রচারের ফলে প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ করেছে? ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা —এ সবই হল ধর্মজীবনের ভিত্তি। স্বয়ং যীশুই বলেছেন—"Blessed are the pure in heart, for they shall see God (পবিত্র আত্মারাই ধন্য, কেন না তারা ভগবানকে দর্শন করতে পারবে)। এই seeing God-ই (ভগবানকে দর্শন করা) হল ধর্মজীবনের লক্ষ্য। তা না হয়ে খালি বড় রকমের একটা সঙ্ঘ করা হল, দলের কোটী কোটী লোকের নামে খাতা ভর্তি হয়ে গেল—তাতে ধর্মজগতে বড় কাজ হয় না। রাজনৈতিক ব্যাপারে এ সবের মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম-রাজ্যে নয়। স্বামিজী বলেছিলেন—'এমন কি দশ জন লোককেও যদি প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন দান করতে পারি তবে মনে করব যে, আমার কাজ করা সার্থক হয়েছে। তাঁর এ কথা বলার যথার্থ তাৎপর্য এই যে, ধর্মজীবন লাভ করা অতি কঠিন ব্যাপার। ভগবান লাভ বা ব্রহ্মানুভূতিই হল ধর্ম-জীবন—'Religion is realization' (প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম)। খৃষ্টান পাদ্রীদের মধ্যে খুব বড় বড় মেধাবী পুরুষ আছে, খুব পড়াশুনা করেছে, খুব পাণ্ডিত্য; কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যদি যীশুর উপদিষ্ট ত্যাগ, তপস্যাও থাকত, তবে তো হত!

"তোমরা ঠাকুরের এই পবিত্র সঙ্ঘে এসেছ, ত্যাগীশ্বর ঠাকুরকে তোমাদের জীবনের আদর্শ করেছ এবং সে আদর্শে নিজেদের জীবন গঠন করছ; তোমাদের কল্যাণ হবে, তোমরা

সেই ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হবে—তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। এ সঙ্ঘ যতদিন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্যাদি দ্বারা একমাত্র ভগবান লাভ করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সর্বভাবময় ঠাকুরের জীবনকে আদর্শ করে চলবে, ততদিন এ সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শক্তি অব্যাহত থাকবে নিশ্চয়। কাজকর্ম, প্রতিষ্ঠা এ সব বাড়ানো তো অতি সহজ কথা। কিন্তু একমাত্র ভগবান লাভ করবার জন্যে তপোনিষ্ঠ হয়ে সমগ্র জীবন একভাবে কাটিয়ে দেওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। স্বামিজী বলেছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই হবে আমাদের motto (অনুসরণীয় বাণী)। আগে আত্মজ্ঞান লাভ, তার পরে জগতের হিত। ঠাকুরও নিজ জীবনে তাই করে দেখিয়েছেন এবং স্বামিজী প্রভৃতি সব অন্তরঙ্গ শিষ্যদেরও তাই উপদেশ করেছেন। স্বামিজী এ সঙ্ঘে সেবাদি যে সকল কাজের প্রবর্তন করে গেছেন, সে সব কাজ দৈনন্দিন সাধনভজনের সঙ্গে করতে হবে ভজনসাধনের অঙ্গজ্ঞানে, তবেই কাজও ঠিক ঠিক হবে। তা না করে যদি কেউ খালি কর্ম-স্রোতে গা ঢেলে দেয়, তা হলে শেষ পর্যন্ত টাল সামলানো বড় মুস্কিল। অনেক সময় কাজের খুব সাফল্য দেখে কাজের ঝোঁক বেড়ে যায়। তা কিন্তু ভাল নয়; তাতে শেষ পর্যন্ত জীবনের উদ্দেশ্য ভুল হয়ে যায় এবং সব গুলিয়ে দেয়। ঠাকুরের কাছে আমরা ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ কখন শুনি নি। তাঁর ঐ একমাত্র কথা, একমাত্র উপদেশ—'যো সো করে আগে ভগবান লাভ করে নে।"

জনৈক সন্ন্যাসী—"মহারাজ, ঠাকুর তো সিদ্ধাইকে আধ্যাত্মিক

উন্নতির অন্তরায় বলে গেছেন; কিন্তু যীশুর জীবনী তো, দেখতে পাওয়া যায়, অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করেছেন, রোগ আরাম করেছেন এবং আরও নানা রকম অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়েছেন। তাঁর বারো জন শিষ্যের ভেতরেও শক্তি সঞ্চার করে তাঁদেরও ঐ সকল করতে অনুজ্ঞা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, ঠাকুর তো ঠিকই বলেছেন যে, সাধকদের পক্ষে সিদ্ধাইলাভের দিকে মন দিলে আর ভগবানের দিকে এগুতে পারে না—তার ওখানেই হয়ে গেল। মা ঠাকুরকে দেখিয়েও ছিলেন যে, সিদ্ধাই বিষ্ঠার ন্যায় হেয়। কিন্তু যীশুর জীবনে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, সে সব তিনি আদৌ সিদ্ধাই দেখাবার জন্য করেন নি—জীবদুঃখে কাতর হয়ে জীবের দুঃখ মোচন করেছেন মাত্র। বাইবেলেই আছে যে, তিনি অন্ধ ব্যক্তিকে চক্ষু দান করে বা কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে স্পর্শমাত্রে রোগমুক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন—'এ সব কথা প্রকাশ করো না।' প্রতিষ্ঠা বা লোকমান্য লাভ করার জন্য তিনি কখনও ও সব করেন নি। শাস্ত্রেও আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা আত্মজ্ঞান লাভের পর একমাত্র দয়াবৃত্তি অবলম্বন করে জগতে অবস্থান করেন। তাঁদের আর কোন কামনা বাসনা থাকে না। তা ছাড়া যীশু তো আর সাধারণ সাধক ছিলেন না? তিনি অবতার। জগৎপিতা পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর সত্তা এক হয়েগিয়েছিল। অতএব তাঁর পক্ষে এসব করা কিছুই অস্বাভাবিক বা দূষণীয় নয়। সাধারণ লোক যে সকল কাজকে অতি আশ্চর্য ও অসম্ভব ব্যাপার

মনে করে, সে সব অবতার পুরুষদের পক্ষে শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় অতি সহজ কাজ। সাধ্য সাধনা করে ও সব করতে হয় না। তাঁদের সামান্য ইচ্ছামাত্রেই অঘটন ঘটে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে নাস্তিকদের মনে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মাবার জন্যও যীশু ঐ রকম অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছিলেন। তাঁদের কাজের গূঢ় রহস্য অনেক সময় বোঝা কঠিন।

"শারীরিক ব্যাধি দূর করা স্পর্শমাত্র—এ আর কি বেশী অলৌকিক? এ সব তো সহজ ব্যাপার। ঠাকুর যে সব চাইতে বড় অলৌকিকত্ব দেখিয়ে গেছেন—স্পর্শমাত্র মানুষকে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দিয়েছেন, সমাধিস্থ করেছেন। জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কাররাশি একমুহূর্তে ক্ষীণ করে দিয়ে মানুষের সমগ্র মনের গতি ভগবন্মুখী করে দেওয়া—এ হল সব চাইতে বড় সিদ্ধাই। অমনটী আর কোন অবতার পুরুষ করতে পারেন নি। উঃ! কী কাণ্ডই না ঠাকুরকে করতে দেখেছি! সে সব ভাবতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়। মানুষের মনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন, মনের আড়বাক সব ইচ্ছা মাত্র সোজা করে দিতেন। তাঁর স্পর্শমাত্রে মনের সব ব্যাধি আরাম হয়ে যেত। কি বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির আধার ছিলেন ঠাকুর! বাহির থেকে দেখতে তো সাধারণ মানুষের মত; কিন্তু তাঁর দেহ আশ্রয় করে লীলা করতেন সর্বশক্তিমান ভগবান।"

একজন জার্মান মহিলা ভক্ত মহাপুরুষজীকে ভক্তি ভরে নমস্কার করে দাঁড়াতেই মহাপুরুষজী স্মিতমুখে তাঁকে বড়দিনের অভিনন্দন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কাল ক্রীষ্টমাস ইভ কেমন লাগল?"

মহিলা ভক্ত—"ও! আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। ক্রীষ্টমাসে এমন আনন্দ জীবনে কখনও পাই নি। আমাদের পাশ্চাত্য দেশে ক্রীষ্টমাসে আমোদ আহ্লাদ, খাওয়া দাওয়া, সাজগোজ, নাচগান এ সবেরই আয়োজন বেশী এবং সারা দেশ ঐতেই খুব মেতে যায়। পূজাপাঠ যা হয়, সে সব অনেকটা যেন নিয়ম বাঁধা নির্দিষ্ট ধারা অনুসারে হয়। তাতে আন্তরিকতার অভাব খুবই। আমোদ আহ্লাদেই কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। ওসব বাহ্যিক আড়ম্বরে প্রাণের তৃপ্তি হয় না; তাই গত বৎসর ক্রীষ্টমাসের রাত্রে প্রায় ১টার সময় যীশুর কাছে খুব কাতর প্রাণে প্রার্থনা করেছিলাম যে, প্রভু দয়া করে আমার জীবনে অন্ততঃ একটী বারও ঠিক ঠিক ক্রীষ্টমাসের আনন্দ উপলব্ধি করিয়ে দাও। তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। এবার এখানে ঠিক ঠিক ক্রীষ্টমাসের আনন্দ পেলাম; আমার প্রাণ ভরপুর হয়ে গেছে।"

মহাপুরুষজী—"আমাদের হল ভক্তির পূজা। এখানকার ক্রীষ্টমাস উৎসব সাত্ত্বিক উৎসব। প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, আন্তরিক প্রার্থনা এই হল এ উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এই-ই প্রকৃত ক্রীষ্টমাস।"

মহিলা ভক্ত—"প্রভু কি বাস্তবিক ইহুদি ছিলেন?"

মহাপুরুষজী—'তিনি ইহুদিও ছিলেন না জেন্টাইলও ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ সবের বহু উর্দ্ধ স্তরের—ভগবানের শক্তির অবতার। জীবকে ত্রাণ করবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন নরদেহে।"

বেলুড় মঠ

জানুয়ারী—মার্চ, ১৯৩০

একটী ভক্ত মঠে যোগদান করার মানসে কর্মস্থান হতে চলে এসে মঠে কিছুদিন বাস করছেন। মহাপুরুষজী তাঁকে বলছেন—"ওরা (বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন) টের পেয়েছে যে, তুমি আর যাবে না ?"

ভক্ত—"আজ্ঞে হাঁ।"

মহাপুরুষজী—"তা বেশ! ওদের সব ভোগবাসনা আছে—খুব ভোগ করুক। তোমার ঠাকুরের কৃপায় ভোগবাসনা কেটে গেছে; তুমি এখন এখানেই থাক। ওরা সব আমড়ার অম্বল খাক্ যতদিন ইচ্ছে।"

* * * *

শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসব। আকাশ মেঘলা; একটু বৃষ্টিও হয়ে গেছে। উৎসবের বিরাট আয়োজন হয়েছে। একজন সেবক এসে বললেন—"মহারাজ, আপনাকে চেয়ারে করে নীচে নিয়ে যাব—উৎসবের সাজান সব দেখবেন।"

মহাপুরুষজী—"না, I do'nt like to create a scene (আমি কোন তামাসা সৃষ্টি করতে চাই না)। সকলের খুব আনন্দ, ভক্তি, প্রীতি, শান্তি হোক। ঠাকুর সর্বসাধারণের কল্যাণ করুন—তাতেই আমার আনন্দ। ঠাকুরের ইচ্ছায় মেঘ ও বৃষ্টিটা হওয়ায় ঠাণ্ডা হয়েছে; নইলে লোকজনের বড় কষ্ট হত। তাঁর কাজ তিনি ঠিক করে নেবেন।"

বিকালে মঠের গরুগুলির কথা জিজ্ঞাসা করছেন—"আহা, ওরা বুঝি আজ আর বেরুতে পারবে না! ওদের বড় কষ্ট হবে।" সন্ধ্যার সময় আবার গরুদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, ওদের খেতে দিয়েছে কি না। সেবক খোঁজ নিয়ে এসে বললেন—"হাঁ দিয়েছে।" মহাপুরুষজী শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন।

* * * *

পূর্ববঙ্গের একটি সাধিকা মহিলার কথা উঠল। মহিলাটি খুব সাধনভজন করেন এবং বেশ উন্নত অবস্থা লাভ করেছেন। মহাপুরুষজী বলছেন—"এ সব তাঁর কৃপা। দেবীসূক্তে আছে—'যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি, তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।' (আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি; ব্রহ্মা করি, ঋষি করি এবং প্রজ্ঞাশালী করি)। তাঁর কৃপাই আসল—তা পুরুষশরীরে বা স্ত্রীশরীরে যাতেই হোক।"

বেলুড় মঠ

এপ্রিল—সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

রামনবমী। তুলসী দাসের কথা হচ্ছে। মহাপুরুষজী বলছেন—"তুলসী দাস খুব নাম প্রচার করে গেছেন। নাম আর নামী এক জিনিস। হরিনাম—রামনাম। তুলসী দাস কত বড় ভক্ত ছিলেন! আজ খুব রামনাম কর। রাম রাম সীতারাম।"

জনৈক সন্ন্যাসী গলার মালার সঙ্গে একটা কবচে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদধূলি ধারণ করেছেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে বলছেন—

"দাও, আমাকে দাও। ঐ তো ধারণ করতে হয়। দাও, আমার মাথায় দাও।"

শরীরের কথা হচ্ছে। বললেন—"শরীর এখন খারাপ হয়ে গেছে; আর কিছু নেই। ঠাকুর যতদিন ইচ্ছা খাড়া করে রেখেছেন ও রাখবেন। শরীর থাকলে তাঁর সব শুভ কাজের একটু প্রসার হয়—এই আর কি!"

একটী সাধু পূর্বাশ্রম হতে পিতামাতা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে ফিরেছেন। সেখানে প্রায় হাজার লোক তাঁকে দেখতে এসেছিল। মহাপুরুষজী বলছেন—"তা বেশ, একজন সন্ন্যাসীকে ওরা দেখলে। ভালই হবে। খাঁটী সন্ন্যাসী হওয়া বড় কঠিন।" সাধুকে আশীর্বাদ করছেন—"খুব তোমার শুদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধ জ্ঞান হোক! দুই-ই এক।"

একটী স্ত্রীভক্ত আত্মহত্যা করেছেন। সেই কথা সেবকের সঙ্গে হচ্ছে। মহাপুরুষজী—"আফিং খেয়ে মরেছে শুনেছ? যাক্, রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে করেছে—তা তার আত্মা ঠিক ঠাকুরের কাছে যাবে। ভক্ত ছিল ঠাকুরের, মঠের, সাধুদের, আমাদের উপর বেশ টান ছিল। প্রারব্ধ ছিল, তাই করেছে। নিশ্চয় সদ্গতি হবে। তবে কিছুদিন অন্ধকারের মত আবরণের ভিতর থাকতে হয়।"

জনৈক পার্শী ভক্তের চিঠি এসেছে। সেবককে বললেন—"বেশ গুছিয়ে ভাল করে লিখে দাও যে, সে যা করছে তা ঠিকই করছে। জরথুষ্ট্ররূপে ঠাকুরই এসেছিলেন। আবার সেই জরথুষ্ট্রই ঠাকুর রূপে এসেছেন।" পরে একটী প্রাসিয়ান ইহুদী

ভদ্রলোকের কথায় বলছেন—“লোকটা বৈজ্ঞানিক। যুদ্ধের সময় কি একটা খাবার আবিষ্কার করেছিল—রাঁধতে হয় না। বলেছিল—‘ইচ্ছা করলে ক্রোড় ক্রোড় টাকা করতে পারতুম।’ বেশ ভাল মানুষ। প্রথমটা আডায়ারে থিওসফিক্যাল্ সোসাইটীতে এসে থাকে। তার ইহুদী ধর্ম ভাল লাগে না। থিওসফিও তার পছন্দ হল না। তারপর মান্দ্রাজ ষ্টুডেণ্টস্ হোমে এসেছিল। পরে মঠে এসে দেখা করে। প্যালেষ্টাইন, জেরুজালেম এ সব দেখতে গিয়েছিল। তা তার ভাল লাগে নি। বল্লে—“না, ওখানে ধর্মভাব নেই। এখন আমেরিকায় আছে।”

আমেরিকায় কয়েকখানি চিঠি লিখতে হবে। সেই কথা হচ্ছে। বলছেন—“এ সব চিঠিপত্র লেখাতে একটা প্রীতির ভাব প্রকাশ হয়। অবশ্য ভিতরকার দৃষ্টি খুলে গেলে দেখা যায় সবই ব্রহ্ম—‘একত্বমনুপশ্যতঃ কেন কং বিজানীয়াৎ’ (যিনি একত্ব দেখেন তিনি আলাদা আর কাকে জানবেন)? তবে বাইরে আবার এই নানাবুদ্ধি প্রভৃত একটা ভাবের আদানপ্রদান দরকার।”

ঢাকার দাঙ্গার কথা হচ্ছে। মহাপুরুষজী বলছেন—“মা কেন এমন করলেন। ঠাকুরই ভরসা—তিনি রক্ষা করবেন। ঢাকাতে কখনও এতটা হয় নি। মায়ের ধ্বংসলীলা চলছে। ‘Out of evil cometh good’ (মন্দ থেকে ভাল হয়)। এ থেকেও কল্যাণ হবে। তিনি দয়া করুন, শান্তি দিন সকলের। কারুরই অনিষ্ট না হোক এই চাই।”

একটী সাধু প্রায় এক মাস কঠিন অসুখে শয্যাগত থেকে ভাল হয়ে উপরে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে এসেছেন।

মহাপুরুষজী তাঁকে দেখে আনন্দে বলছেন—"এস, এস!—আরে ন— উপরে এসেছে! বেশ বাবা, ঠাকুরের কৃপায় ভাল হয়েছ। —ঠাকুর তোমাকে ভাল করেছেন। জয় ঠাকুর! তোমাদের কোন ভাবনা নেই। তোমাদের সব ঠাকুর দয়া করবেন। তোমরা সমস্তটা ঠাকুরকে অর্পণ করেছ, তাঁর আশ্রয় নিয়েছ; তিনি তোমাদের রক্ষা করবেন। স্বাস্থ্যলাভ, জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি সব ঠাকুর দেখবেন। আচ্ছা যাও, বাবা, আর দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট কোরো না। অ্যাঁ! কেমন হয়ে গেছে ফ্যাকাশে। আবার খেলেদেলে রক্ত হবে। জয় ঠাকুর! খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"

মঠের বিস্তৃত মাঠের চোরকাঁটা অনেকটা তোলা হয়েছে—উপরের আফিস্ ঘরের জানালা থেকে তাকিয়ে মহাপুরুষজী দেখলেন। বললেন—"বেশ বেশ, মাঠ পরিষ্কার হচ্ছে; গরুগুলি এখন ঘাস খেতে পারবে আর তোমাদের আশীর্বাদ করবে।"

আর একদিনের ঘটনা। একটী ভক্তের পত্র এসেছে। বলছেন—"ঠাকুরের নাম যথাসাধ্য করছে। একটু ভাল লাগে —ঐটুকু হলেই বেঁচে যাবে। নামে প্রীতি হলে আর ভাবনা নেই। গোলমাল কত রকম তো আছেই—থাকবেও। খুব ঠাকুরের নাম করুক, তবেই কল্যাণ হবে। জন্মাষ্টমীতে রাত তিনটা পর্যন্ত পূজো করেছিল—বেশ, বাঃ বাঃ!"

মহাপুরুষ মহারাজ শুয়ে আছেন। কয়েকটী দেবীর নামাবলী, বেদান্তের বাক্যসংগ্রহ এবং দেবীসূক্তটী শায়িত অবস্থাতেই পাঠ করলেন। তারপর উঠে বলছেন—চমৎকার, চমৎকার! বেশ খাসা খাসা চিন্তাপ্রবাহ সব আসছিল। সেই শিব

স্থির হয়ে আছেন, আর মা তাঁর উপর নাচছেন। শিব তো চিরকালই স্থির; আর মায়ের নাচ তো চিরকালই চলছে। ভিতরে স্থির বরাবর—বাইরে এই লীলাময়ীর লীলা।"

একটী ব্রহ্মচারী এক দিন প্রশ্ন করলেন—"জ্ঞানের ভাবের দিকে যখন ঝোঁক হয় তখন ইষ্টমন্ত্র জপ না করে শুধু ওঁকার জপ করা চলে কি?"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, বেশ তো। সেই ওঁকারই তো ভগবান। ঠাকুরকে ওঁকার ভাবে চিন্তা করা চলে। কোন আপত্তি নেই।" কয়েক দিন পরে সেই ব্রহ্মচারীটীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি, ওঁকার করছ?" ব্রহ্মচারী "হাঁ" বলতে তিনি খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন—"বেশ, বেশ, বেশ!" তখন ব্রহ্মচারীটী বললেন—"কিন্তু মহারাজ, ওঁকার জপ করতে করতে শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে বড় ভয় হয়।" মহাপুরুষজী—"ঐ রকম যখন হয় তখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে—'হে ঠাকুর তুমিই ওঁকারস্বরূপ। আমি যাতে ঠিক পথে যাই তাই কর। যাতে ঠিক বস্তু—যা সেই জ্ঞান বা ভক্তি (সেই একই বস্তু) —লাভ করতে পারি তাই কর।' এই রকম খুব প্রার্থনা করবে।"

একজন সাধুর খুব কঠিন পীড়া হয়েছে। মহাপুরুষজী তাঁর জনৈক সেবককে বলছেন—"আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে ওকে একবার দেখে আসি। চেয়ারে বসিয়ে দুজনে ধরে আমায় নিয়ে যাবে নীচে? রোগীর কাছে গেলে খুব উপকার হয়। সহানুভূতি দরকার। দশজনের সহানুভূতিতে অসুখ ভাল হয়ে যায়।"

জনৈক সেবকের অসুখ করাতে আর একটী সাধু তাঁর জায়গায় দুদিন রাত্রে মহাপুরুষজীকে দু ঘণ্টা করে বাতাস করছেন। তৃতীয় দিন তাঁকে বলছেন—"তোমার বড় কষ্ট হবে—থাক্—দরকার নেই।" তখন সাধুটী বললেন—"না, না, মহারাজ! কিছু কষ্ট হবে না। আপনাদের সেবা না করলে আমাদের কল্যাণ হবে কি করে?"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, তা ঠিক। আমরা বুড়ো সাধু, আর ঠাকুরের দাস; আমাদের সেবা করলে কল্যাণ হবে, এতে সন্দেহ নেই।"

একবার মঠের একজন সন্ন্যাসী খুব ব্যাকুল হয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন—"মহারাজ, ছবিতে ঠাকুরকে দেখাই কি সার হবে? আমাদের কি উপলব্ধি হবে না?" মহাপুরুষজী তৎক্ষণাৎ খুব আশ্বাস দিয়ে তাঁকে বললেন—"না, না, ছবিতে কেন? (নিজের হৃদয় দেখিয়ে) এইখানে সাক্ষাৎ জীবন্ত মূর্তি উপলব্ধি হবে।"

আজ জন্মাষ্টমী। জনৈক সন্ন্যাসী মহাপুরুষজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঠাকুরের জন্মাষ্টমীর দিনে কোন বিশেষ ভাব টাব হত কি?"

মহাপুরুষজী—"তা অত কি মনে আছে? তাঁর তো একটু কিছু হলেই ভাব হয়ে যেত। কথামৃতে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তাও তো অসম্পূর্ণ। মাষ্টারমশাই তো সব দিন যান নি, আর যা শুনেছেন, সব কি লিখতে পেরেছেন? অবশ্য ওঁর স্মৃতিশক্তি খুব ছিল। কিন্তু তা হলেও শুনে আর কতটা লেখা যায়?"

সন্ন্যাসী—"স্বামিজীর একটা ইচ্ছা ছিল যে, ঠাকুরের ছেলে-দের প্রত্যেককে তিনি যে সব বিশেষ বিশেষ উপদেশ দিতেন সেগুলি প্রত্যেকের নিকট হতে সংগ্রহ করে রাখা হয়।"

মহাপুরুষজী—"তা সে সব এখন কি করে পাবে? সে লোক তো অধিকাংশই নেই।" সন্ধ্যাবেলায় একটী ভক্তকে মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন—"যাও, আরতি দর্শন কর গে। বেলুড় মঠে ঠাকুর সাক্ষাৎ বিরাজ করছেন। স্বামিজী বসিয়ে দিয়ে গেছেন। সত্য জানবে।"

ঠাকুরের পূজারী মহারাজ এক দিন প্রণাম করতেই মহাপুরুষ মহারাজ ভাবস্থ হয়ে—"জয় গুরু মহারাজ, জয় গুরু মহারাজ" বলে উঠলেন। একটু পরে পূজারীর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন—"বেশ, তুমি ঠাকুরের পূজা করছো। খুব ভক্তিবিশ্বাস হোক। পূজা শেষে এই বলে প্রার্থনা করবে—'ঠাকুর, তোমার পূজা তুমি কৃপা করে করিয়ে নাও। আমি তোমার পূজার কি জানি?' যারা যারা ঠাকুরের সেবার কাজ করছে এখানে, সকলেরই মহাকল্যাণ হবে। অনেকে বলে—'ঠাকুর তো সব জায়গায় আছেন।' হাঁ, সত্য; কিন্তু এখানে (মঠে) তাঁর বিশেষ প্রকাশ। স্বামিজী বসিয়ে গেছেন এখানে।—সেই যে আত্মারামের কৌটা।"

আর এক দিন উক্ত পূজারী সাধুটীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বিকালে ঠাকুর ঘর খুলে একটু জপটপ কর তো?"

পূজারী—"হাঁ, মহারাজ।"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, সর্বদা ওইখানে একটা ভাবধারা বজায় রাখতে হবে। ঠাকুরঘরে গেলে মনে হবে যেন সাক্ষাৎ ভগবানের

কাছে এসেছি। তিনি ভক্তি ভক্ত ভালবাসেন। তা নইলে সগুণ ঈশ্বর কি? শুধু একটু ধ্যান করলাম—ওতে চিঁড়ে ভিজে না। ভক্তি চাই। দুই-ই চাই।"

সকালে অনেক সাধু মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়েছেন। মালাজপের কথা উঠল। মহাপুরুষজী বললেন—"মোটা বুদ্ধি যাদের তারা বলে যত বেশী সংখ্যা জপ করবে তত তাঁর বেশী দয়া হবে। কিন্তু তিনি কি সংখ্যা দেখেন? হৃদয় কতটা তাঁর দিকে গেল তাই দেখেন। ভাব যদি জমে যায় তো সংখ্যা নাই রাখলে।"

জনৈক সাধু—"হাঁ, মালা জপ করাটাও অনেক সময় বিক্ষেপ বলে মনে হয়।"

মহাপুরুষজী—"হা, তা বই কি। আমি মালা টালা জপি নে। তুলসী দাস বলেছেন—'মালা জপে শালা।' তবে একটা রাখতে হয়—দেখাতে হবে তো সাধু (হাস্য)। ওই একটা (দেয়ালস্থিত নিজের ফটোর গায়ে ঝুলানো মালা ছড়াটী দেখিয়ে) রেখেছি। জপা টপা হয় না। ওই (ছবিটা) জপে (হাস্য)। ঠাকুর বলতেন—প্রথমে জপ, তারপরে ধ্যান, তারপর ভাব, সমাধি ইত্যাদি।"

বিকালে মহাপুরুষ মহারাজ উপরে গঙ্গার দিকের বারান্দায় পায়চারী করছেন। বারান্দার এক পাশে পূজনীয় খোকা মহারাজ ইজি চেয়ারে বসে ভাগবত পড়ছেন। মহাপুরুষজী খোকা মহারাজের দিকে তাকিয়ে এক জনকে বলছেন—"খোকা মহারাজ খুব ভাগবত পড়ছেন।"

সেবক—"হাঁ, আরও পুরাণ ইত্যাদি পড়েছেন। শিবপুরাণ পড়েছেন।"

খোকামহারাজ—"হাঁ, একটা কিছু নিয়ে থাকা।"

মহাপুরুষজী—"একটা কিছু কেন? ভাগবত কি কম? পুরাণ ভাগবতাদিতে তো সেই সত্যের কথাই বলেছে।"

সন্ধ্যার পর। ঐ বারান্দা থেকে পূর্ণিমালোকে আলোকিত গঙ্গা দেখে মহাপুরুষ মহারাজ করযোড়ে বলছেন—"জয় মা, জয় মা! ভক্তি দাও গঙ্গে!"

রক্তের চাপ বেড়েছে। ডাক্তারেরা বেশী কথাবার্তা কইতে নিষেধ করেছেন। সেই কথা মহাপুরুষজীর কাছে সেবক তুললে তিনি বললেন—"আমি রামকৃষ্ণের চেলা। তিনি অত ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও যখনই কেউ এসেছে, তার জন্য কত ভাবনা, কত আলাপ। আর আমি চুপ করে বসে থাকব? শরীর খারাপ, তা কি হবে? তোমরা এসে শুধু প্রণাম করে চলে যাও—তোমরাই বা কি ভাববে? ভাববে—'রামকৃষ্ণের চেলা এই রকম'।"

বেলুড় মঠ

শুক্রবার, ১১ই মে, ১৯৩০

রাত্রিবেলা জনৈক দক্ষিণদেশীয় সন্ন্যাসী মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে নিজের প্রাণের আর্তি জানিয়ে বললেন—"মহারাজ, আমি ভগবানকে সর্বভূতে দর্শন করতে চাই। কি করে তা সম্ভব, আপনি দয়া করে আমায় বলে দিন।"

মহাপুরুষজী—"বাবা, আগে ভগবানকে নিজ হৃদয়ে দর্শন করতে হবে। অন্তরে তাঁর দর্শন না হলে বাইরে সর্বভূতে তাঁকে দেখা কি করে সম্ভব? আত্মানুভূতিতে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন অন্তরে বাইরে সর্বত্র তাঁর দর্শন হয়; তখনই 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই অবস্থা লাভ হয়।"

সন্ন্যাসী—"সত্য কথা, সর্বভূতে দয়া ও প্রেম, নির্বিকার চিত্তে সব দুঃখ সহ্য করা ইত্যাদি নৈতিক গুণের উৎকর্ষ ও পূর্ণতা সম্পাদনে সে অবস্থায় পৌছান যায় কি?"

মহাপুরুষজী—"হাঁ, নৈতিক চরিত্র গঠনে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধ মনে ক্রমে ভগবদ্ ভাবের স্ফুরণ হয়। কিন্তু কেবল মাত্র নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করলেই যে ভগবদ্দর্শন হবে তা তো আমার মনে হয় না। নিরন্তর তাঁর ধ্যান করতে করতে তিনি কৃপা করে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিভাত হন। চাই তাঁর ধ্যান—সর্বদা তাঁর স্মরণমনন। সত্যস্বরূপ, বিভু, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, চৈতন্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দকে ভাবনা করতে করতে মানুষ ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যো সো করে একবার ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সব হয়ে গেল। তখন আর আলাদা করে নৈতিক চরিত্র গঠনের দরকার হয় না। সত্য, দয়া, প্রেম এ সকল সদ্‌বৃত্তি তখন আপনা হতেই এসে পড়ে। ঠাকুর বলতেন যে, বাপ যে ছেলের হাত ধরেছে সে ছেলের আর পড়ে যাবার ভয় নেই। আসল কথা কি জান, বাবা? কৃপা, কৃপা! তিনি কৃপা করে দর্শন দিলেই মানুষ তাঁর দর্শন পেতে পারে। ভজনসাধন এ সব মনকে ভগবন্মুখী

করার উপায় মাত্র।" এই বলে মহাপুরুষজী মধুর কণ্ঠে গান ধরলেন—

'তুমি নাহি দিলে দেখা, কে তোমায় দেখিতে পায়।
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায়?
তুমি পূর্ণ-পরাৎপর, তুমি অগম্য অপার।
ওহে নাথ, সাধ্য কার ধ্যানেতে ধরে তোমায়॥
মনেরে বুঝাই কত, তুমি বাক্য মনাতীত।
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত, তোমারে দেখিতে চায়॥
দিয়ে দীনে দরশন, করহে দুঃখ মোচন।
ওহে লজ্জানিবারণ, শীতল কর হৃদয়॥'

খুবই তন্ময় হয়ে গানটী গেয়ে পরে ধীরে ধীরে বল্লেন—"ঠাকুর বলতেন যে, কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না? এই পাল তুলে দেওয়াই হল পুরুষকার—সাধনভজন। ভগবৎ-কৃপা উপলব্ধি করার মত করে নিজকে তৈরী করতে হবে—ভজনসাধন দ্বারা। বাকী তাঁর কৃপা। নিরন্তর তাঁর স্মরণ-মনন, তাঁর ধ্যান করতে করতে মনপ্রাণ শুদ্ধ হয়ে যায়; আর ঐ শুদ্ধ মনে স্বতঃই ভগবদ্‌ভাবের স্ফুরণ হয়, ভগবৎকৃপা প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া তোমরা সাধু হয়েছ, সব ছেড়ে ছুড়ে তাঁর আশ্রয়ে এসেছ, ভগবান লাভ করাই তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তোমাদের তো তাঁকে নিয়েই সর্বক্ষণ থাকতে হবে। ঠাকুরের কথায় আছে না যে, মৌমাছি ফুলেই বসে—মধুই পান করে? তেমনি তোমরাও শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, সর্বাবস্থায় ভগবানকে নিয়েই বিলাস করবে। তাঁর

ধ্যান, তাঁর নামজপ, তাঁর বিষয় স্মরণ, তাঁর বিষয় পাঠ, আলোচনা, তাঁর কাছে প্রার্থনা এই সব নিয়েই তোমাদের থাকতে হবে। তবেই জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি পাবে, আর তাঁর আশ্রয়ে আসাও সার্থক হবে। ভগবান অন্তর্যামী। যেখানে আন্তরিক ব্যাকুলতা, সেখানে তাঁর কৃপাও হয়। তাঁর রাজ্যে অবিচার নেই।"

বেলুড় মঠ

মঙ্গলবার, ২৪শে জুন, ১৯৩০

মহাপুরুষজী খুব তন্ময়ভাবে এই গানটি গাইলেন—

"শ্যামা মা কি কল করেছে! কালী মা কি কল করেছে!
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে।
আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘুরায় ধরে কলডুরি।
কল বলে আপনি ঘুরি জানে না কে ঘুরাতেছে॥" ইত্যাদি

গানটি বারংবার গেয়ে চুপ করে বসে রইলেন! পরে আপন মনেই বল্লেন—"আমরা জানি মা-ই সত্য, মা দয়াময়ী, আর কিছু জানি নে, বুঝি নে, জানবার দরকারও নেই।"

খানিক পরে জনৈক ব্রহ্মচারী সাধনভজনে উন্নতি করতে পারছে না এবং নিজের মানসিক অবস্থা ও অশান্তি জানিয়ে মহাপুরুষজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করাতে তিনি খুব আবেগভরে বল্লেন—"মা তোমায় খুব কৃপা করুন, তোমার মনের সব অশান্তি দূর করে দিন। পড়ে থাক বাবা, তাঁর দুয়ারে, তিনি ক্রমে সব ঠিক করে দেবেন।

কিছুতেই হতাশ হয়ো না! খুব প্রাণ ভরে তাঁর নাম করবে; আর আন্তরিক প্রার্থনা করবে—'ঠাকুর, তুমি দয়া কর। আমি অতি অবোধ, তোমাকে কি করে ডাকতে হয় জানি নে। তুমি কৃপা কর। তোমার শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণ ভক্তি, পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ জ্ঞান দাও। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে! তুমি দয়া কর। আমার হৃদয়ে প্রকাশ হও।' তুমি নিজের ভজনসাধন কাজকর্ম নিয়ে থাকবে। অন্যে কি করল না করল তা দেখে তোমার কি হবে? যে করবে তারই হবে, সেই আনন্দ পাবে। ভগবানের চিন্তা বড় সহায়ক জিনিস। ধ্যানজপ করলে, ভগবানের নাম করলে, বুদ্ধিশুদ্ধি সবই ঠিক হয়ে যাবে, রিপু দমন হয়ে যাবে। খুব অনুরাগের সহিত একটু করেই দেখ। কর, কর বাবা, খুব অনুরাগের সঙ্গে তাঁর নাম করে যাও! তাঁর নামেই সব শক্তি আছে।"

বেলুড় মঠ

মঙ্গলবার, ১৫ই জুলাই, ১৯৩০

আজ সকাল হতেই মঠে বহু সাধু ও ভক্ত সমাগম—যেন ছোট খাট একটী উৎসব। মহাপুরুষজীর নিকটও দর্শনাকাঙ্ক্ষী এবং দীক্ষার্থীদের ভিড়। তিনিও অক্লান্তভাবে সকলকে উপদেশাদি দানে পরিতৃপ্ত করছেন। বিকেল বেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় সেবক মহাপুরুষজীকে বলল—"মহারাজ, য— আপনাকে দর্শন করতে আসতে চান। আপনার দর্শনের জন্য তাঁর মন খুবই অশান্ত হয়েছে, তাই অনুমতি ভিক্ষা করে ফোন করেছিলেন।"

মহাপুরুষজী—"ঐ তো সেদিন এসেছিল—অনেক কথাবার্তা হল। এরই মধ্যে আবার কি অশান্তি এল তার মনে? খালি ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ শুনে গেলে কি হবে? সে সব ধারণা করা চাই—উপদেশ মত কাজ করা চাই। নইলে বাবা কিছুই হবে না। কেবল বলবে—'মনে ভারি অশান্তি।' অথচ যেমনটী বলব তেমনটী করবে না। এই করে কি অশান্তি যায়? শাস্ত্রে তো অনেক উপদেশ আছে। খালি শাস্ত্র পড়লে কি কিছু হয়? শাস্ত্রের উপদেশ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়। ঠাকুর যেমন বলতেন—'পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি নিঙ্‌ড়াও, এক ফোঁটাও পড়বে না।' তেমনি সাধুসঙ্গই কর, শাস্ত্রই পড়, সাধনা না করলে কিছুই হবে না। * * * আর অত কাছে বসে কথা বলা—তাও আমার মোটেই ভাল লাগে না। সকলের নিশ্বাস সইতে পারি নে; অনেক সময় নেহাৎ জোর করে বসে থাকতে হয়। তাই তো যখন খুবই অসহ্য হয়ে ওঠে তখন আমি এক এক সময় উঠে পড়ি। আর বাবা, অত কথাও বলতে পারি নে। আমার মনের অবস্থাও তেমন নয়। নেহাৎ বলতে হয়, তাই বাধ্য হয়ে কথাবার্তা বলি। ওরা তো জানে না যে, এতে আমার কতটা মানসিক ক্লান্তি হয়। চুপচাপ বসে থাকতেই ভাল লাগে—আনন্দম্। অবশ্য তা বলে কাউকে কি আসতে নিষেধ করি? তা নয়। জানি ওরা হৃদয়বান, ভক্ত—তবে * * * খুবই ভাবপ্রবণ। মনে করে ঐ একটুতেই ভাব হয়ে গেল। অত সোজা কি? তার জন্য কত কাঠ খড় পোড়াতে হয়! খালি বললেই তো হবে না? এর জন্য মনকে কত তৈরী করতে হয়। কত সংযম, কত সাধনভজন চাই। * * *

নিজের ভাবে দৃঢ় না হলে, ভাব পাকা না হলেই এদিক ওদিক হয়। আসল কথা কি জান? ঠিক ঠিক ভালবাসা নেই, ভগবৎপ্রেম নেই। বুক ফাটা তেষ্টা পেলে কি সারা জীবন জল বেছে বেড়াতে পারে? ঠাকুরকে পেয়েছে, তাঁর আশ্রয় নিয়েছে। তাতে হয় না, আবার অন্য একটা চাই! অনুরাগ নেই। নিষ্ঠা নেই। ঠাকুরকে নিয়ে নিজের ভাবে পড়ে থাক—ক্রমে সব হবে। তাই তো ঠাকুর প্রায়ই গাইতেন—

'আপনাতে আপনি থেকো মন যেয়ো নাকো কারো ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন সেই পরশ মণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥'

এই রকম ভাব নিয়ে লেগে থাকতে হয়। তিনি তো আত্মারাম, সকলের ভেতরেই রয়েছেন। অন্তরে বসে তিনিই সব জানিয়ে দেন। ব্যাকুল হয়ে চাইলেই তিনি পূর্ণ করে দেন। সকলের অভীষ্ট ফল দেবার মালিক তিনি। যে যা চাইবে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলই তিনি দেন। সদ্‌গুরুনির্দিষ্ট পথে ধীরভাবে চলে যেতে হয়। এ বাবা, বড় কঠিন পথ। চাই নিষ্ঠা, চাই শ্রদ্ধা, আর অদম্য অধ্যবসায়। যেমন এক জায়গায় খানিকটা খুঁড়ে জল পেলে না বলে আর এক জায়গায় খুঁড়তে লেগে গেল—সেখানেও জল পেলে না বলে আর এক জায়গায় খুঁড়তে সুরু করল—এইভাবে সারা জীবন তার মাটি খোঁড়াই সার হবে—জল সে কখনও পাবে না। তেমনি যে সাধক একই সাধন মার্গে লেগে থাকতে না পারে তার কখনও ভগবান লাভ হয় না। * * * আমি তো তার সম্বন্ধে সব শুনেছি,

তাই দুঃখ হয়। কি অব্যবস্থিত চিত্ত! Depth (গভীরতা) নেই মোটেই, সবই ভাসা ভাসা। নিজের ভাবে দৃঢ় না হয়ে অত পাঁচ জায়গায় যাতায়াত, পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা করা ভাল নয়। তাতে নিজের ভাব নষ্ট হয়ে যায়। 'হাঁ—জী, হাঁ—জী করতে রহ বৈঠে আপন ধাম।' (২।৩ বার বললেন) 'আপন ধাম' ঠাকুর বলতেন—আপনার ভাব। আপন ভাবে পাকা হয়ে—নিজের ভাব দৃঢ় করে নিতে হয়। আবার সকলের সঙ্গে মিলেমিশেও থাকতে হয়। আরে বাবা! ঠাকুরের নামেই তোমার আনন্দ হবে—তাঁর নামে সব পাবে—ভাব, সমাধি সব। কিন্তু সবই সময়সাপেক্ষ। তারপর তুমি গৃহস্থ মানুষ—নিজের কর্তব্য কর্মও তো আছে? হাঁ। মাঝে মাঝে হয়ত কোথাও গেলে। নির্জন বাস খুবই ভাল—ঠাকুর বলতেন। কিন্তু তা না হলেই কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না সে কি কথা? এক জনের কথা কায়মনোবাক্যে মানতে হয়। সেই জন্যই তো শাস্ত্রে গুরুকরণের উপদেশ রয়েছে। সদ্‌গুরু রাস্তা বাতলে দেন—ঠিক রাস্তা ধরিয়ে দেন।

'ধর্ম' ওরা কি বোঝে? অমন অনেক ভাবসমাধি আমরা দেখেছি। ওসব ঠাকুরের ভাব নয়। ওসব লোক দেখান ভাব—ওতে বরং অনিষ্ট হয়। ঠাকুর বলতেন—ধ্যান করবে মনে, কোণে আর বনে। যারা নিম্ন অধিকারী তারাই একটুতেই বলে বেড়ায়—পাঁচ জনকে দেখিয়ে বেড়ায়। ঐ রকম সব বাহ্যিক expression (অভিব্যক্তি) কেন দেখায়? ওতে এই বেশ বোঝা যায় যে নিজের ভাবে এখনও দৃঢ় হয় নি—পাকা হয় নি। ছট্‌ফট্‌ করলে কি হয়? সাধনভজনে ডুব মারতে হয়—নিজের ভেতর ভাব জমাতে

হয়। * * * অন্যের ভাবভক্তি দেখে সাময়িক কতকটা উচ্ছ্বাস ও ব্যাকুলতা আসে কিন্তু সকলকেই অনেক খাটতে হয়েছে—ধৈর্য ধরে অনেক ভজনসাধন করতে হয়েছে, তবে তো ভগবানের কৃপা পেয়েছে। আন্তরিক হলে তিনি কৃপা করবেনই। তাঁর রাজ্যে অবিচার নেই। তিনি সমদর্শী। যে চায় সেই তাঁকে পায়। ভগবানের দয়া সকলের উপরই আছে, তিনি তো দয়া করবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছেন। ব্যাকুল হয়ে চাইলেই পাবে। চাইবে না, কিছু করবে না, খালি ছট্‌ফটানি—খালি হা হুতাশ—আমার কিছু হল না—আমার কিছুই হল না! একদিনেই তো হয় না? Introspection (আত্মপরীক্ষা) চাই। ঐটুকু আর regular practice (নিয়মিত অভ্যাস)। সাধনভজন থাকলে আর ভাবনা নেই—শান্তি অবশ্যই পাবে। করে তো দেখুক কি করে শান্তি না পায়। * * * তাকে বলে দিও যে এখন আমার কাছে আসার কোন দরকার নেই। যা যা বলবার আমি সে দিনই সব বলে দিয়েছি। এখন শান্তি চায় তো কাজ করুক।" সেবকের কেবলই মনে হচ্ছিল যে—আহা! তিনি প্রত্যেক ভক্তের কল্যাণের জন্য কত ভাবেন! কত গভীরভাবে চিন্তা করেন!

বেলুড় মঠ

শনিবার, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩০

কাল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শুভ জন্মতিথি। মঠের কয়েক জন ত্যাগী যুবকের ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা হবে। ঐ সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ বল্লেন—"স্বাধ্যায় খুব ভাল। শাস্ত্রাদি পাঠও

সাধনারই অঙ্গ। ব্রহ্মচারীদের পক্ষে প্রথমটায় গীতাখানি বেশ ভাল করে পড়া দরকার। গীতার মত কি আর গ্রন্থ আছে? বড়ই সুন্দর। ওতে সব ভাবই রয়েছে—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ। আমার ঐটাই সব চাইতে ভাল লাগে যে, স্বয়ং ভগবান তাঁর ভক্তকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন—'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' আহা! কত বড় আশ্বাসের কথা! তিনি বড় আশ্রিতবৎসল! যে কায়মনোবাক্যে তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছে তার আর কোন ভাবনা নেই। তিনি তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। আহা, কত কৃপা! কিন্তু কি মহামায়ার মায়া যে, মানুষ তাঁর এহেন কৃপা বুঝতে পারে না। যত বড় বিদ্বান, বুদ্ধিমান হোক না কেন, তাঁর কৃপাকটাক্ষ ছাড়া এ মায়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। তিনি দয়া করে মায়ার আবরণ একটু সরিয়ে দিলে তবেই জীব তাঁর কৃপা বুঝতে পারে।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥'*

আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান, কাইজার এরা সব কত বড় বীর; জগৎটাকে যেন চুরমার করে দিতে পারত! জাগতিক হিসাবে এরা অবশ্য খুবই শক্তিমান পুরুষ; কিন্তু এ সৃষ্টিপ্রবাহ, যা অনাদি কাল থেকে চলছে, তাতে এরা সামান্য একটা বুদ্বুদ্ মাত্র। তাদের ঐ শক্তি দ্বারা এ মহামায়ার ফাঁদ কাটতে পারে

* এই আত্মাকে বহু বেদপাঠ সহায়ে, অথবা ধারণাশক্তি সহায়ে, কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না।

না। আর যতক্ষণ তা না হল, সবই বৃথা—মানবজন্মই ব্যর্থ হল। সেখানে চাই ভগবৎকৃপা। আর সেই ভগবৎকৃপা লাভের গুহ্য উপায়ও ভগবান নিজেই বলে দিচ্ছেন—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥*

তুমি মদ্গতচিত্ত, আমার ভক্ত ও আমার পূজনশীল হও। আমাকেই নমস্কার কর। তা হলে আমার প্রসাদলব্ধ জ্ঞানদ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হবে। সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি—কারণ তুমি আমার প্রিয়। সমস্ত ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। আমি তোমায় সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব। শোক করো না।

জনৈক ভক্ত দীক্ষা প্রার্থনা করায় তিনি বললেন—"আমার দীক্ষায় লুকনো কিছু নেই। আমি জানি যে, যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নিলেই মুক্তি। যে তাঁর শরণাপন্ন হবে তিনি তাকে উদ্ধার করবেন নিশ্চয়। এ যুগধর্ম। ঠাকুর বলেছিলেন যে, বাদসাহী আমলের টাকা এ যুগে চলে না। রামকৃষ্ণ নামই এ যুগের মন্ত্র। দীক্ষা আর কি? ঠাকুরই দীক্ষা। আমি বাবা তান্ত্রিক দীক্ষা বা ভটচার্যি দীক্ষা জানি নে। তাঁর নাম জপ কর দেখি! আর খুব প্রার্থনা কর—'হে প্রভু, আমায় দয়া কর।' আন্তরিক প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই। ঠাকুর নিজে বলেছেন—'যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই ইদানীং (নিজের শরীর দেখিয়ে) এরূপে

এসেছেন। এ বাবা স্বয়ং ভগবানের কথা—যুগাবতারের বাণী। আমরাও বলছি তাই। এ যুগে ঠাকুরের নাম নিলেই মুক্তি। এ অন্ধ বিশ্বাসটী নিয়ে থাকতে পার তো এসো—যা জানি প্রাণ খুলে শেখাব; নইলে যাও যুক্তিতর্ক কর গে; পরে সময় হলে আসবে। এ গোঁড়ামি নয়—এ প্রত্যক্ষ সত্য। আমরা জানি যে, ঠাকুরই স্বয়ং সনাতন পরব্রহ্ম। এ বিশ্বাস থাকা চাই। তুমি ভাল ছেলে, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, যথেষ্ট উৎসাহ আছে, পড়াশুনা করেছ অনেক; আরও কর; আর সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির কর; প্রাণে অনুরাগ জাগাও, ব্যাকুলতা বাড়াও; খুব তাঁকে ডাক। দেখবে সময়ে সব হয়ে যাবে। মন তৈরী কর। তিনি বলতেন—'ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে। তাই বলছি, আগে হৃদয়-পদ্ম বিকশিত করবার চেষ্টা কর; গুরুকৃপা আপনি এসে যাবে তখন। তিনি তো অন্তর্যামী—তোমার হৃদয়েই তিনি রয়েছেন তোমার অন্তরাত্মা রূপে। সময় হলেই তিনি সব জানিয়ে দেবেন।

সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা ভাল। এত দিন এই সব তো করলে। এখন আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য চেষ্টা কর দেখি! এই হল জীবনের সব চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা—ভগবানকে জানা। উঠে পড়ে লাগ! খুব তেজের সহিত মনের সমস্ত শক্তি ঐ দিকে চালিত কর—প্রকৃত জীবনলাভের জন্য।"

ভক্তটী খুব বেশী আগ্রহান্বিত হওয়ার পরে মহাপুরুষজী তাকে দীক্ষা দান করতে সম্মত হলেন।

বেলুড় মঠ

রবিবার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩০।

আজ শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি। ভোর হতেই মহাপুরুষ মহারাজের মুখে মা, মা রব; যেন মাতৃগতপ্রাণ একটী শিশু! করযোড়ে চক্ষু মুদ্রিত করে প্রার্থনা করছেন—"মা, মা, মহামায়া, জয় মা, জয় মা। মা আমাদের ভক্তি বিশ্বাস, পূর্ণ বিশ্বাস, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অনুরাগ, ধ্যান, সমাধি দিন। ঠাকুরের এ সঙ্ঘের কল্যাণ করুন, সমগ্র জগতের কল্যাণ করুন, জগতে শান্তিবিধান করুন।" পরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় বল্লেন—"আমাদের ভক্তি নেই, তাই এ সব দিনের মাহাত্ম্য ঠিক ঠিক বুঝতে পারি নে। আজ কি যে-সে দিন? মহামায়ার জন্মদিন। জীব-জগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং মহামায়া আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষলীলা বোঝা বড় শক্ত। তিনি কৃপা করে না বোঝালে কে বুঝবে? কি সাধারণভাবে তিনি থাকতেন! কি চাপা! ঠিক যেন ছদ্মবেশে থাকতেন। আমরা তাঁকে কি বুঝব? একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক জেনেছিলেন। তিনি একদিন আমায় বলেছিলেন—'ঐ যে মন্দিরের মা, আর এই নহবতের মা—অভেদ।' আর বুঝেছিলেন স্বামিজী। আহা! মা ঠাকরুণের উপর কী গভীর ভক্তিই না তাঁর ছিল! তিনি বলেছিলেন যে, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সমুদ্রপারে গিয়ে জগৎ জয় করে এসেছেন।"

যত সাধুভক্ত প্রণাম করতে আসছিলেন তাঁদের অনেককেই

তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন—"তুমি মাকে দেখেছ ?" রবিবার বলে ভক্তসংখ্যা একটু বেশী হয়েছিল। প্রায় তিন হাজার ভক্ত নরনারী পরিতোষপূর্বক প্রসাদ পেয়েছিলেন। সকাল বেলা বেশ মেঘ করাতে সকলেরই ভয় হয়েছিল বুঝিবা বৃষ্টি হয়ে মায়ের উৎসবের আনন্দে ব্যাঘাত হয়। জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী মেঘের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করাতে মহাপুরুষজী একটু চুপ করে থেকে বল্লেন—"না, কোন ভয় নেই। মায়ের কৃপায় আজকের দিন ভালই যাবে। তিনি মঙ্গলময়ী সব মঙ্গলই করবেন।" বিকেল বেলা পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ মায়ের উৎসব দেখতে এসেছিলেন। তাঁকে দেখে মহাপুরুষজী ভারি খুসী। মায়ের মন্দিরে ৺চণ্ডীর গান হচ্ছিল। মঠে এই প্রথম ৺চণ্ডীর গান। মহাপুরুষজী বারংবার চণ্ডীর গান কেমন হচ্ছিল সে খোঁজ নিচ্ছিলেন। পরে তিনি বলেছিলেন—"আমাদের মায়ের নাম সারদা। ঐ মা-ই স্বয়ং সরস্বতী। তিনিই কৃপা করে, জ্ঞান দেন। জ্ঞান অর্থাৎ ভগবানকে জানা এই জ্ঞান হলেই ঠিক ঠিক পাকা ভক্তি হওয়া সম্ভব। জ্ঞান না হলে ভক্তি হয় না। শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি এক জিনিস। মায়ের কৃপা হলেই তা হওয়া সম্ভব। মা-ই জ্ঞান দেবার মালিক।"

বেলুড় মঠ

বৃহস্পতিবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মতিথি। সারাদিন পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, ভোগরাগ ও প্রসাদ বিতরণাদিতে সমগ্র মঠ আনন্দমুখরিত।

সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী মঠে সমবেত হয়ে সেই আনন্দ সম্ভোগ করছে।

মহাপুরুষজী সকাল হতেই "জয় রামকৃষ্ণ, জয় প্রভু, জয় ভগবান, আজ বড় শুভদিন। তিনি নিজে স্বয়ং অহেতুকী কৃপাতে এই ধরাধামে এসেছিলেন। এমনটী আর হয় নি। সমস্ত পৃথিবী তাঁর দয়ায় বেঁচে গেল। না, এমনটী আর হয় নি" ইত্যাদি নানা প্রকার ভাবোক্তি আপন মনেই করছিলেন। অগণিত ভক্ত স্ত্রী পুরুষ তাঁকে প্রণাম করতে আসছে, তিনিও অক্লান্তভাবে সকলকে ভাবস্থ হয়ে খুব আশীর্বাদ করছেন। আর কেবলই প্রার্থনা করছেন—"যে যেখানে আছে, সকলের কল্যাণ হোক; প্রভু, সকলের কল্যাণ কর, সঙ্ঘের কল্যাণ কর, সমগ্র জীবজগতের কল্যাণ কর।" বহু দীক্ষার্থীকেও তিনি কৃপা করলেন।

দুপুরে আহারের সময় সেবক শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের প্রসাদাদি নিয়ে এল; কিন্তু মহাপুরুষজীর আজ আর আহারাদিতে মোটেই মন নেই। "জয় গুরুদেব. জয় প্রভু" বলে সামান্য একটু প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দিয়ে বল্লেন—"যা, এ সব নিয়ে যা। আজ আবার খাব কি? আজ এ সব খাবারের কোন প্রয়োজন নেই। ঠাকুর এসেছেন আজ। আজ যে কী দিন তা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আজ কি যেমন তেমন দিন? সমস্ত জীবজগৎ, অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আজ এসেছিলেন। এমন কখন হয়? যিনি একদিন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গরূপে এসেছিলেন, তিনিই আবার শত শত বৎসর পরে রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ওঃ, আমি আর ভাবতে, ধ্যান করতে পাচ্ছি নে। আজ কত

বড় দিন! আহা! ঠাকুরের জন্মতিথি দিনে তাঁর কথা বলতে বলতে আমার কথা ও দেহমন শুদ্ধ হয়ে গেছে। যদি আজ এ দেহ চলে যায় সে তো আনন্দের কথা! এই ঠাকুরের স্থানে এত সাধুভক্তদের কাছে তাঁর কথা বলতে বলতে, তাঁর তিথিপূজার দিনে দেহত্যাগ করা তো মহা সৌভাগ্যের কথা।”

বিকেল বেলাও বহু ভক্তের ভিড়। যাঁরাই আসছেন তাঁরা মহাপুরুষজীকে ভাববিহ্বল দেখে মুগ্ধ নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকছেন। আর তাঁর পূত আশীষবাণীতে প্রাণে এক অভিনব আনন্দ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা অনুভব করে পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরে যাচ্ছেন। — রাণী ও রাজা প্রভৃতি প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই তিনি বল্লেন—“কে রাজা, কে রাণী আমি ও সব বুঝি নে। এক নারায়ণই সত্য, এক তিনিই আছেন। ঠাকুরই সব। জীবজগতের কল্যাণের জন্য তিনি এসেছেন। এ বার্তা প্রচারের জন্যই তো এ দেহটা এখনও আছে। নইলে কেন থাকবে? আমার তো আর কোন কামনা বাসনা নেই। যত দিন এ দেহ আছে তাঁর বাণী প্রচার করব—এই জীবনের একমাত্র ব্রত। যতদিন তাঁর কাজ থাকবে ততদিন এ দেহ থাকবে।”

দুজন আমেরিকান মহিলা ভক্ত তাঁকে দর্শন করতে এসে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে মহাপুরুষজী ইংরাজীতে বল্লেন—আজ আমি খুব চমৎকার আছি। আহা! সারা পৃথিবী আজ আনন্দমগ্ন। এই দিনে প্রভু জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমার ভেতরে যে কি রকম অনুভূতি হচ্ছে, তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে পাচ্ছি নে। আজ কী শুভদিন। এত বড়

বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি আগে কখনও পৃথিবীতে আসে নি। সমগ্র জগৎ তরে যাবে। ঠাকুর কে ছিলেন এবং জগৎকে কি দিয়ে গেলেন তা বুঝতে এখনও শত শত বৎসর লাগবে।

রাত্রে মা ৺কালীর পূজা হবে। পূজায় বসবার পূর্বে পূজারী মহাপুরুষজীকে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করাতে তিনি বল্লেন—"বেশ, খুব ভক্তির সহিত মায়ের পূজো কর বাবা। আজ মায়ের বিশেষ আবির্ভাব। এই মায়ের শক্তিতেই তো সব। এ যুগে ঠাকুরের ভেতর দিয়েই তাঁর শক্তি খেলা করছে! ঠাকুর তো আর কেউ নন। সেই মা ৺কালীই ঠাকুররূপে জগতে এসেছিলেন। যখন তাঁর কথা ভাবি তখন এক একবার মনে হয়, বাবা! কার কাছে ছিলুম! স্বয়ং ভগবান, সাক্ষাৎ জগজ্জননী! আমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে। যারা ঠাকুরকে দেখে নি কিন্তু আমাদের দেখেছে তাদেরও কল্যাণ হবে। আমরা তো ঠাকুরেরই অংশ।"

বেলুড় মঠ

শুক্রবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

কাল শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ও উৎসবাদি খুব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। কাল সারা দিনরাতই মহাপুরুষ মহারাজের যে ভগবদ্ভাবের আতিশয্য দেখা গিয়েছিল আজও তা অনেকটা রয়েছে। মহামায়ার পূজার্চনা, পাঠ ও ভজনাদিতে সারা রাত সমগ্র মঠ মুখরিত ছিল। রাত্রিশেষে পূজান্তে হোম হয়। সেই

হোমাগ্নিতে পরে বিরজা হোম ও ব্রহ্মচর্য হোম হয়েছিল এবং মহাপুরুষজী সাতজন ব্রহ্মচারীকে পবিত্র সন্ন্যাসধর্মে ও তিনজনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন। যদিও কাল তাঁর শরীরের উপর খুবই খাটুনি গিয়েছিল তথাপি তাঁকে দেখে মোটেই ক্লান্ত মনে হচ্ছিল না। প্রাণের দিব্য আনন্দচ্ছটায় তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত দেখাচ্ছিল।

সকালে ৺কালী পূজার সব রকম প্রসাদাদি তাঁর সামনে আনা হল। তিনি খুবই ভক্তিভরে চোখ বুঁজে করযোড়ে সেই মহাপ্রসাদকে প্রণাম করে সব প্রসাদই অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করে জিবে ঠেকালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন—"মা করুণাময়ী, মা মা, জগতের কল্যাণ কর মা।" তাঁর সেই সকরুণ প্রার্থনার ধ্বনি উপস্থিত সকলের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত প্রবেশ করছিল।

পরে নব-দীক্ষিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করতে এলেন। সকলকে কার কি নাম হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন এবং প্রত্যেকেরই নাম শুনে আনন্দ প্রকাশ করতে করতে হঠাৎ একেবারে গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"নামরূপ এ সবই বাহ্যিক, সবই অনিত্য—দুদিনের; এ সব কিছুই নয়। নামরূপের পারে যেতে হবে; সেই পরমানন্দ লাভ করতে হবে; আত্মবস্তু লাভ করতে হবে। সন্ন্যাসের অর্থ তো তাই। বিরজা হোম করে শিখাসূত্র ত্যাগ করে গেরুয়া পরা ও সন্ন্যাসী হওয়া তো সহজ। সে তো প্রবর্তক সন্ন্যাসী মাত্র; কিন্তু খাঁটী সন্ন্যাসী হওয়া বড় কঠিন। মহাবাক্য নিত্য ধ্যান করো। যাও বাবা, এখন খুব ধ্যান লাগাও। আত্মবস্তু অনুভব কর। তবেই ঠাকুরের

সঙ্ঘে আসা, সন্ন্যাস নেওয়া এ সব সার্থক হবে। আমার কথা শুনতে চাও তো এই।”

নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীরা আশীর্বাদ ভিক্ষা করাতে তিনি প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে বল্লেন—“তোমরা ত্যাগীশ্বর ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছ—দেহ, মনপ্রাণ সব তাঁর চরণে অর্পণ করেছ। তোমরা আমাদের পরম প্রিয়। আমি খুব প্রার্থনা করছি তোমাদের ভগবানে ভক্তি বিশ্বাস অচল অটল হোক। প্রভুর নামে যে গৈরিক ধারণ করেছ, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই গৈরিকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রভুর সেবা করে যাও। তিনি কল্পতরু; তাঁর কাছে খুব প্রেম ভক্তি চাইবে, ব্রহ্মবিদ্যা চাইবে। তিনি সব দেবেন, পরিপূর্ণ করে দেবেন। তোমাদের অদেয় তাঁর কিছুই নেই। দেবীসূক্তে আছে—

‘অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মানং
তমৃষিং তং সুমেধাম্॥’*

“দেব ও মনুষ্য কর্তৃক প্রার্থিত সেই ব্রহ্মতত্ত্ব তিনি নিজেই কৃপাপরবশ হয়ে উপদেশ করছেন। আর যাকে যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি কৃপাকটাক্ষে ব্রহ্মা, ঋষি ইত্যাদি করে দেন। তিনি তো কৃপা করবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছেন; চাইলেই দেন।

* দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্তৃক প্রার্থিত এই ব্রহ্মতত্ত্ব আমি নিজেই বলছি। যাকে যাকে আমি রক্ষা করতে ইচ্ছা করি, তাকে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করে থাকি। কাকেও ব্রহ্মা, কাকেও ঋষি, কাকেও বা প্রাজ্ঞ ও মেধাবী করি।

অতঃপর তিনি এই শ্লোকটি বারংবার আবৃত্তি করতে লাগলেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥*

পরে সন্ন্যাসীরা কোথায় মাধুকরী করতে যাবে ইত্যাদি দু চার কথার পরে বল্লেন—"গেরুয়া পরলে কিন্তু বেশ সুন্দর দেখায়। বাইরের গেরুয়াই সব নয় বাবা, ভেতরটা রঙ্গিয়ে নিতে পারলে তবেই হবে। সেই আসল জিনিস।"

বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ জনৈক সেবককে বলছেন—"ওঃ, কাল কত বড় দিন গেল! যেমন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ, কপিলাবস্তুতে বুদ্ধদেব, নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ, তেমনিই তো এ যুগে ঠাকুর এসেছেন। একটা ক্ষণমাহাত্ম্য মানতে হয়। আহা! ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বর্ণনাদি কেমন চমৎকার রয়েছে। সব মধুময়, আনন্দময়। দিক সকল, আকাশ, পুর, গ্রাম, গোষ্ঠ, বৃক্ষলতা, গুল্ম সবই মঙ্গলময়। চারিদিক শান্ত! কি সুন্দর বর্ণনা।" এই বলতে বলতে সেবককে ভাগবত থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম পড়তে আদেশ কল্লেন।

* হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী এমন কি সর্বজ্ঞত্বও কামনা করি নে। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে, তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়।

বেলুড় মঠ

১৯৩১

মহাপুরুষ মহারাজের শরীর এত দুর্বল যে, অন্যের সাহায্য ব্যতীত নিজের খাট হতে নীচে নামতেও কষ্ট হয়। রাত্রে প্রায়ই ঘুম হয় না। সেজন্য রাত্রেও সেবকগণ পালা করে কেউ না কেউ সর্বক্ষণ তাঁর কাছে থাকেন। তিনি সারা রাতই ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন; কখনও নিকটস্থ সেবককে কথামৃত, গীতা, উপনিষদ্‌ বা ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে কোন নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করতে বলেন, এবং তন্ময় হয়ে শোনেন। আবার কখনও বা চুপচাপ ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন বা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট করযোড়ে কাতর প্রার্থনা করেন সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য। আহা, সে কী আবেগপূর্ণ ভাষা! কখনও বা দেবদেবীর ছবি বুকে করে শুয়ে থাকেন। সর্বক্ষণই এক দিব্য ভাবে মাতোয়ারা। সেবক যদি কখনও জিজ্ঞাসা করেন—"মহারাজ, একটু ঘুমুবেন না?" তখন বলেন—"আমার আবার ঘুম কি রে?" এবং সঙ্গে সঙ্গে সুর করে গাইতে থাকেন—

"ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
এবার যোগ নিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
এবার আমি ভাল ভাব পেয়েছি, ভাল ভাবীর কাছে
ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নেই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥"

একবার ঘুমের প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"চণ্ডীতে আছে যে, মা-ই সেই নিদ্রারূপিণী—'যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।' তিনি সকলের অধিষ্ঠানরূপিণী, চরাচর সমস্ত জুড়ে রয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। 'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা' সেই মা-ই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আধার। মা আমার হৃদয়-কন্দর আলোকিত করে সর্বক্ষণ বিরাজ করছেন। তাঁকে দর্শন করলেই সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়; ঘুমের আর কোন দরকারই বোধ হয় না। যখনই একটু শ্রান্তি বোধ করি তখনই মাকে দেখে নেই। ব্যস, আনন্দম্! সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়।"

রাত্রি প্রায় তিনটা। চারদিক্ নিস্তব্ধ। সমগ্র জগৎ ঘুমন্ত শিশুর ন্যায় সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করছে। সমগ্র মঠও যেন গভীর ধ্যানমগ্ন। মহাপুরুষজীর ঘরে একটী ক্ষীণ বৈদ্যুতিক আলো জলছিল। তিনি পার্শ্বস্থ সেবককে লক্ষ্য করে বল্লেন—"দেখ, গভীর রাতে খুব জপ করবে। ঐ হল জপধ্যানের খুব প্রশস্ত সময়। জপ করতে বসলে হয়তো ঘুম পাবে, কিন্তু তবু জপ ছেড়ো না। পরে দেখবে জপ করতে করতে একটু তন্দ্রার মত এলেও সে সময়ও ভেতরে জপ ঠিক চলবে। সোজা হয়ে যাতে বসতে পার তেমনি ভাবে আসন করো। কখনও যদি বেশী ঘুম পায় তো আসন ছেড়ে উঠে পড়বে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা হেঁটে-হেঁটে জপ করবে। 'হাতে কাজ মুখে হরিনাম' অর্থাৎ চলতে ফিরতে, কাজকর্ম করতে করতে, সব সময়ই মনে মনে জপ করে যাবে। এই ভাবে কিছুকাল জপ করে যাও; তখন

দেখবে যে, মনের একটা অংশ সর্বক্ষণ জপে লেগে থাকবে—একটা অন্তঃপ্রবাহী স্রোতের মত সর্বাবস্থায় জপ চলবে। খুব খেটে রোখ করে দু তিন বছর যদি দিনে রাতে সমানে জপ চালাতে পার তো তখন দেখবে যে, সব আয়ত্তাধীনে এসে যাবে। চণ্ডীতে 'মহারাত্রির' কথা আছে জান তো? ঐ মহারাত্রিই হল সাধনভজনের প্রকৃষ্ট সময়। তখন একটা আধ্যাত্মিক ধারা বইতে থাকে। মন যত সূক্ষ্ম হবে, তত ঐ ধারার প্রভাব বুঝতে পারবে। সাধু রাত্রে বেশী ঘুমুবে কেন? দু এক ঘণ্টা ঘুমুলেই যথেষ্ট হল। সারারাত যদি ঘুমিয়ে কাটাবে তো জপধ্যান করবে কখন? মহানিশায় সমগ্র প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করে। তখন অল্পায়াসেই মন স্থির হয়ে যায়। হৃদয়ে উচ্চ ভাব, উচ্চ চিন্তা সহজেই আসে।"

সেবক অতি ভয়ে ভয়ে বললেন—"আমার তো জপধ্যানে তেমন মন বসে না। জপ করতে বসলেই দেখি যে, যত বাজে চিন্তা এসে মনকে তোলপাড় করে তোলে। আপনার সেবার সঙ্গে সঙ্গে—এবং অন্য কাজকর্মের ভেতর বরং ভগবানের স্মরণ-মনন হয়, মন শান্তভাব ধারণ করে এবং তাতে আনন্দও পাই। কিন্তু যখনই জপধ্যান করতে বসি তখনই মন যেন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই ভাবে মনের সঙ্গে লড়াই করে করে, একটা মহা অশান্তি ভোগ করে, শ্রান্ত হয়ে উঠে পড়তে হয়। এ ভাবটা আগে ছিল না। এখন কিছু কাল যাবৎ—বিশেষ যত দিন থেকে আপনার সেবা করতে আরম্ভ করেছি ততদিন থেকেই মনের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।"

সেবকের মনের অশান্ত অবস্থার কথা শুনে মহাপুরুষজী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন; পরে ধীরভাবে বল্লেন—"হাঁ, কোন কোন মনের ঐ রকম বিদ্রোহী ভাব থাকে। সে মনকেও বশে আনবার উপায় আছে। সে রকম অশান্ত মনকেও ক্রমে শান্ত করে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করা যেতে পারে। ধ্যানজপ করতে আসনে বসে তখনই জপ বা ধ্যান সুরু করো না। প্রথমটায় ধীরভাবে বসে ঠাকুরের নিকট কাতর প্রার্থনা করবে। ঠাকুর হলেন জীবন্ত সমাধিস্বরূপ। তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করে তাঁকে চিন্তা করলেই মন সমাহিত হয়ে যাবে। বলবে—"প্রভু, আমার মন স্থির করে দাও, আমার মন শান্ত করে দাও।" এইভাবে খানিকক্ষণ প্রার্থনা করে ঠাকুরের সমাধির কথা ভাববে। তাঁর যে ছবি দেখছ, এ ছবি খুব উচ্চ সমাধি অবস্থার ছবি। সাধারণ লোক এ ছবির কোন তাৎপর্য বুঝতে পারে না। পরে চুপচাপ বসে মনকে লক্ষ্য করতে থাকবে যে, মন কোথায় ছুটে যায়। তুমি তো আর মন নও। মন হল তোমার, তুমি মন হতে স্বতন্ত্র, আত্মস্বরূপ। ধীরভাবে দ্রষ্টার মত বসে মনের গতিবিধি লক্ষ্য করে যাবে। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার পর মন আপনা হতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তখন মনকে ধরে এনে ঠাকুরের ধ্যানে লাগাবে। যতবার মন পালিয়ে যাবে ততবারই মনকে ধরে নিয়ে আসবে। এই রকম করতে করতে দেখবে যে, মন ক্রমে শান্ত হয়ে যাবে। তখন খুব প্রেমের সহিত ভগবানের নাম জপ করবে, তাঁর ধ্যান করবে। কিছু দিন ঠিক যেমন

বল্লুম তেমনি করে যাও দেখবে যে, মন তোমার বশে এসেছে। তবে কিন্তু খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য নিয়মিতভাবে এটী করে যেতে হবে।"

সেবক—"আমার তো মনের যা অবস্থা দেখছি তাতে সাধন ভজন কিছু হবে বলে মনে হয় না। ভরসা কেবল আপনাদের আশীর্বাদ।"

মহাপুরুষজী সস্নেহে বল্লেন—"বাবা, আশীর্বাদ তো খুবই আছে। তোমরা সর্বস্ব ছেড়ে ঠাকুরকেই জীবনসর্বস্ব করেছ; তোমাদের উপর আশীর্বাদ থাকবে না তো কার উপর থাকবে? কিন্তু তোমাকেও খাটতে হবে। ঠাকুর যেমন বলতেন—'কৃপাবাতাস তো বইছেই; তুই পাল তুলে দে না।' ঐ পাল তোলাই হল নিজের চেষ্টা। ঐকান্তিক অধ্যবসায়, পুরুষকার চাই—বিশেষ করে সৎ কাজের জন্য, সাধন ভজনের জন্য। আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য সিংহবিক্রম প্রকাশ করতে হবে। উদ্যম ছাড়া, পুরুষকার ছাড়া কিছুই হবার জো নেই। পাল তুলে দিলে তাতে কৃপাবাতাস লাগবেই। যতদিন মানুষের অহংবুদ্ধি আছে ততদিন অধ্যবসায় রাখতেই হবে। তোমরা সাধু হয়েছ, বাপ মা, ঘরবাড়ি সব ছেড়ে এসেছ কেন? না, ভগবান লাভ করবে বলে। আর পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে, ভগবৎকৃপায় ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে পড়েছ, তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছ; বিশেষ করে আমাদের কাছে সর্বক্ষণ থাকার সুযোগও ঠাকুর করে দিয়েছেন। এত সব সুযোগ পেয়েও যদি জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায় তার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? মনে খুব জোর আনবে। তাঁর পতিতপাবন

নাম নিয়ে এ ভবসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ; একটু জোর ঢেউ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? এ সব তো মহামায়ার বিভীষিকা। এ সব দেখিয়ে তিনি সাধকদের পরীক্ষা করেন। ও সবে যখন সাধকের মন বিচলিত না হয়, সাধক যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সুমেরুবৎ অচল অটল থাকে, তখন মহামায়া প্রসন্না হয়ে মুক্তির দ্বার খুলে দেন। তিনি প্রসন্না হলেই সব হল। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।'* বুদ্ধদেবের জীবনীতে পড় নি? স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও মহামায়া মারের রূপে কত বিভীষিকা দেখিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আসনে বসে সংকল্প করলেন—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং, নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥'

অর্থাৎ এই আসনেই আমার শরীর শুকিয়ে যাক্; ত্বক, অস্থি, মাংস, সব ধ্বংস হোক্; কিন্তু বহুকল্পদুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করে এ আসন থেকে আমার শরীর বিচলিত হবে না। কী দৃঢ় সংকল্প! শেষটা মা প্রসন্না হয়ে নির্বাণের দ্বার উন্মোচন করে দিলেন এবং বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করে ধন্য হলেন। ঠাকুরের জীবনেও তাই হয়েছিল। তাই বলছি, বাবা, খুব চেষ্টা কর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সাধনভজনে লেগে যাও। মন বসছে না বলে জপধ্যান ছেড়ে দিলে চলবে কেন? দেখ না আমাদের জীবনই। ঠাকুরের ছেলেদের প্রত্যেকের জীবনই কঠোর সাধনার জীবন্ত আদর্শস্বরূপ। মহারাজ, হরি মহারাজ, যোগেন মহারাজ এঁরা সকলেই কত কঠোর তপস্যাই না করেছেন। অথচ

* এই মহামায়াই প্রসন্না হয়ে মনুষ্যদিগকে মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন।

সাক্ষাৎ যুগাবতার ঠাকুরের অজস্র কৃপালাভ করেছিলেন তাঁরা। তিনি তো ইচ্ছামাত্রেই সকলের ব্রহ্মজ্ঞান করিয়ে দিতে পারতেন। স্পর্শমাত্র সমাধিস্থ করে দিতেন; কিন্তু তবু তিনি আমাদের কত কঠোর সাধনা করিয়ে নিয়েছেন। ভগবৎকৃপা হলে সাধনের পথও সুগম হয়, বাধাবিঘ্ন সব দূর হয়ে যায়। ভগবান দেখেন প্রাণ, তিনি দেখেন আন্তরিকতা। ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকলেই তিনি দেখা দেন। এই যে তিনি দয়া করে দেখা দেন, এইটিই তাঁর কৃপা। তিনি তো স্বাধীন, স্বতন্ত্র। তিনি কি আর সাধন ভজনের বশ যে, এত জপ করলে, এত ধ্যান করলে, এত কঠোরতা করলে তিনি এসে দর্শন দেবেন? তা নয়। তবে সাধন মানে হল একমাত্র তাঁকেই চাওয়া। জগৎ সংসার ছেড়ে, মান-যশ, দেহসুখ এমন কি নিজের অস্তিত্বও ভুলে গিয়ে, ইহকাল, পরকাল সব ভুলে গিয়ে একমাত্র তাঁকেই চাওয়া। যে এমনিভাবে ভগবানকে পেতে চাইবে তাকে তিনি কৃপা করে দর্শন দেবেন। তিনি অশেষ কৃপা করে দর্শন দেন বলেই জীব তাঁকে দেখতে পায়; এই হল তাঁর কৃপা। তিনি যদি দয়া করে দর্শন না দিতেন তাহলে জীবের সাধ্য কি যে তাঁর দর্শন পায়? তিনি যেমন ভক্তবৎসল তেমনি কৃপাসিন্ধু।"

সেবক—"একমাত্র ভরসা আছে যে আপনাদের আশ্রয় পেয়েছি। যাতে ঠিক ঠিক কল্যাণ হয় আপনারা তাই করবেন। একবার যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন আর ত্যাগ করবেন না।"

মহাপুরুষজী—"ঠাকুর বড় আশ্রিতবৎসল; তিনি শরণাগতপালক। তিনি একবার যার হাত ধরেছেন তার এ ভবসমুদ্রে ডুবে যাবার আর কোন ভয় নেই। চণ্ডীতে আছে—'ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং

ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি।' অর্থাৎ তোমার আশ্রিত মানবগণের বিপদ থাকে না; তোমাকে যারা আশ্রয় করবে তারা সকলেরই আশ্রয়-স্বরূপ হয়। কায়মনোবাক্যে ঠাকুরকে ধরে থাক; তিনি ভববন্ধন মুক্ত করে দেবেন। ঠাকুরের চরণে যারা অনন্যশরণ হয়েছে, যাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি, তাদের মুক্তির ভাবনা নেই। মুক্তি তাদের হয়ে যাবে। সে ভার আমাদের উপর—আমরা তা বুঝে নেব। শেষ সময়ে ঠাকুর সকলকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন নিশ্চয়। কিন্তু শুধু মুক্তিলাভ করার জন্যই যে সাধনভজন করার প্রয়োজন তা নয়। সাধনভজন করে এই দেহেতেই ভগবান লাভ করে জীবন্মুক্ত হয়ে থাক। খুব তাঁকে ডাক, প্রাণভরে তাঁর নাম কর, তাঁর ভাবে ডুবে যাও, জীবন্মুক্তির আনন্দ সম্ভোগ করবে। তা ছাড়া স্বামীজি যে সঙ্ঘ গঠন করেছেন তারও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যারা ঠাকুরের এই সঙ্ঘে স্থান পেয়েছে তাদের প্রত্যেকের উপর স্বামিজী ন্যস্ত করে গেছেন বিরাট দায়িত্ব। প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে ত্যাগ ও তপস্যামর এমন আদর্শ জীবন গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রত্যেকের জীবন ঠাকুরের পবিত্র সাত্ত্বিকভাব প্রচারের উপযোগী যন্ত্রস্বরূপ হয়, যাতে সমগ্র জগৎ তাঁর পবিত্র সঙ্ঘকে দেখে এমন কি, তাঁর সঙ্ঘের প্রতি অঙ্গের ভেতর দিয়ে ঠাকুরকে বুঝতে পারে। স্বামিজী বলেছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' তা এ জগতের ঠিক ঠিক হিত তখনই হবে যখন সমগ্র জগতে ঠাকুরের উদার সার্বভৌম ভাব প্রচার হবে। আর সে কাজের ভার ন্যস্ত করে গেছেন তিনি সমগ্র সঙ্ঘের উপর।"

বেলুড় মঠ

১৯৩১

মহাপুরুষ মহারাজ এক দিন সন্ন্যাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে বলেছিলেন—"সাধু উঠবে খুব সকালে। রাত তিন চারটার পর আর ঘুমুবে না। সাধু তখন আর ঘুমুবে কি? ঠাকুরকে দেখেছি তিনটার পর আর কখনও ঘুমুতেন না, ভগবানের নাম করতেন। সাধু সকাল সকাল স্নান করবে। স্নান করে ধ্যানধারণাদি করবে। স্নান করেই খাবে না। স্নান করে ধ্যানভজন না করে খাওয়া—সে তো অন্যান্য লোকেরা করে, সাধু তা করবে না। সাধুর চেহারা, কথাবার্তা সবই অনুরূপ হবে—সরল, সুন্দর, দেবোপম। সাধুর টাকা কেন থাকবে? সাধু একদম নির্ভরশীল হবে—ঠাকুর আছেন তিনিই দেখবেন। সাধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, কিন্তু তা বলে বিলাসিতা করবে না। ত্যাগের পথে যারা থাকবে তাদের পক্ষে বিলাসিতা ভাল নয়। সাধু রাত্রে বেশী খাবে না। ঠাকুর বলতেন—রাত্রের খাওয়া হবে জলখাবার মত। সাধু মূর্খ হবে না, বিদ্যাচর্চা করবে। সাধুর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। সাধু মিষ্টভাষী, ধীরস্থির হবে, ভদ্র ব্যবহার করবে। সাধু সর্বদাই কামিনীকাঞ্চন থেকে তফাৎ থাকবে। কামিনীকাঞ্চনের কোন সংসর্গ রাখবে না।"

বেলুড় মঠ

শুক্রবার, ৪ঠা মার্চ, ১৯৩২

শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন মহাপুরুষ মহারাজ চিঠিপত্রাদি সব সময় নিজে পড়তে পারেন না। বিকেল বেলা জনৈক সেবক তাঁকে চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিলেন; তিনিও খুব নিবিষ্ট মনে সব শুনছিলেন। একটি ভক্ত খুব কাতর হয়ে প্রাণের বেদনা জানিয়ে লিখেছেন—'প্রাণে মহা অশান্তি। সাধন-ভজন যথাসাধ্য করে যাচ্ছি; কিন্তু তাতে শান্তি পাচ্ছি না। কি করলে প্রাণে শান্তি পাব, কি করলে তাঁর কৃপা হবে, তাঁর দর্শন পাবো, দয়া করে জানাবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনার কৃপা হলেই ভগবৎকৃপা হবে এবং আমার এ মানবজীবন ধন্য হয়ে যাবে, ইত্যাদি। শুনে মহা-পুরুষজী বল্লেন—"আহা! এরা আর্ত। এদের হবে। একটা উপায় আছে—বিশ্বাস। খুব বিশ্বাস যদি থাকে যে, শ্রীশ্রীঠাকুর যুগাবতার, স্বয়ং ভগবান, এবং তাঁরই এক সন্তান আমায় কৃপা করেছেন, তাহলে সব হয়ে যাবে। তাঁর অবতারত্বে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া চাই। তিনিই তো গুরুরূপে আমার হৃদয়ে বসে ভক্ত-দের কৃপা করছেন। লিখে দাও—'খুব কাঁদ বাবা, কাঁদ। কান্না ছাড়া অন্য উপায় জানি নে। প্রভু আমায় কৃপা কর, দেখা দাও, দেখা দাও, বলে খুব কাঁদ। তাঁর জন্য যত কাঁদবে ততই তিনি তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠবেন। খুব প্রেমের সহিত কাঁদ, ব্যাকুল হয়ে কাঁদ। ঠাকুরের কাছে শুনেছি—"হরি, দিন তো গেল সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে। তুমি পারের কর্তা,

জেনে বার্তা, ডাকি হে তোমারে। শুনি কড়ি নাই যার, তারে কর হে পার। আমি দীন ভিখারী, নাইকো কড়ি, তাই ডাকি হে কাতর স্বরে" ইত্যাদি।

"তিনিই তো পারের কর্তা; তিনি যদি কৃপা করে এ ভবসিন্ধু পার না করেন তা হলে জীবের সাধ্য কি যে পার হয়। ঠাকুর! তুমি কত অনন্ত, কত গভীর, তোমায় কে বুঝবে? তোমার ইতি কেউ করতে পারে না। তুমি দয়া কর। দয়া করে তোমার স্বরূপ একটু বুঝিয়ে দাও—তা হলেই জীবের ভববন্ধন চিরতরে ঘুচে যাবে।"

একটী ভক্ত ষট্‌চক্রভেদ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। মহাপুরুষজী—"লিখে দাও ও সব জেনে কাজ নেই। খালি কাঁদ, খুব কাঁদ। সরল বালকের ন্যায় কাতরভাবে কাঁদ আর প্রার্থনা কর—'ঠাকুর, আমায় ভক্তি বিশ্বাস দাও; মা, রক্ষা কর। তোমার এ মায়াপাশ থেকে মুক্ত কর।' আমি বাপু, এইমাত্র জানি। মা মা বলে খুব কাঁদ বাবা, কাঁদ। সরল বিশ্বাস নিয়ে তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক—আর কাঁদ, তিনি দয়া করবেনই। আমিও খুব প্রার্থনা করছি খুব এগিয়ে যাও, ধর্মকর্মে খুব অগ্রসর হও।" পরে সেবকের দিকে তাকিয়ে—"তুমি কি গোলমাল আছে তার, বলছ? আমি ওসব কিছু জানি নে। অতীত জীবনে কে কি করেছে না করেছে তা আমি জানতে চাই নে। যা গেছে তা চলে গেছে; এখন সে এখানে এসে পড়েছে, ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছে। সব কেটে যাবে, বেঁচে যাবে। ঠাকুর কপালমোচন। যুগাবতারের শরণাপন্ন হয়েছে

—একি কম কথা? বহু সুকৃতি না থাকলে এটি হত না। তিনি ঠিক উদ্ধার করবেন।"

খানিক পরে জনৈক ভক্ত সেবার জন্য কিছু টাকা দিয়ে প্রণাম করলেন। মহাপুরুষজী ভক্তটিকে বল্লেন—"টাকা দিয়ে প্রণাম করলে কেন? আমার টাকার তো কোন দরকার নেই—আমরা বাবা সাধুমানুষ; টাকা দিয়ে কি করব? ঠাকুরের কৃপায় আমার কোন অভাব নেই। আমি প্রভুর দাস। তিনি দয়া করে 'দো রোটী' দিচ্ছেন। এই বলে গাইতে লাগলেন

'প্রভু মৈ গোলাম, মৈ গোলাম, মৈ গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥
দো রোটী এক লঙ্গোটী তেরে পাস্ মৈ পায়া।
ভকতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাওয়া॥
প্রভু মৈ গোলাম তেরা॥'

তা তিনি দয়া করে 'দো রোটী' তো দিচ্ছেনই আর কি হবে টাকাকড়িতে? নিয়ে যাও বাবা ঐ টাকা। তোমরা গৃহস্থ; তোমাদেরই টাকার দরকার।" ভক্তটি কাতরভাবে নেহাৎ পীড়াপীড়ি করাতে সেবককে ঐ টাকা ঠাকুরসেবায় দিয়ে দিতে বল্লেন।

আবার চিঠি পড়া হতে লাগল। একজন দীক্ষিত ভক্ত দীক্ষা নেবার পূর্বে জীবনে অনেক গর্হিত কাজ করেছিলেন। সেজন্য খুবই অনুতপ্ত হয়ে জীবনের অনেক কথা জানিয়ে কাতরভাবে ক্ষমাভিক্ষা করে লিখেছেন। চিঠি শুনে মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। পরে বল্লেন—

"এর প্রাণে ঠিক ঠিক অনুতাপ এসেছে। অনুতপ্ত! এদেরই হবে। লিখে দাও—'ভয় নেই, ঠাকুর তোমায় উদ্ধার করবেন। তাঁর কাছে কোন পাপই খুব বড় নয়। তোমাদের ত্রাণ করবেন বলেই তো ঠাকুর এসেছিলেন। তিনি অন্তর্যামী; তোমার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব জেনেই তিনি তোমায় কৃপা করেছেন। কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক। এখন থেকে তিনি তোমার হাত ধরে রয়েছেন। আর তোমার পা বেচালে পড়তে দেবেন না। কোন ভয় নেই, বাবা। তাঁকে ব্যাকুলভাবে ডেকে যাও। তিনি তোমায় উদ্ধার করবেন। আর এই যে আমার কাছে তুমি সব দুষ্কৃতি স্বীকার করেছ এতেই তোমার সব পাপ ক্ষয় হয়ে গেল; এখন হতে তুমি নিষ্পাপ, প্রভুর ভক্ত, তাঁর আশ্রিত ও শরণাগত। তাঁর কাছে খালি পবিত্রতা, ভক্তি, প্রেম চাইবে।"

পরে ভক্তি ভক্তের কথায় মহাপুরুষজী বল্লেন—"ঠাকুর বলতেন —'ও বড় দুর্লভ জিনিস। শুদ্ধা ভক্তি জীবকোটীর বড় একটা হয় না।' খুব ভাবের সহিত ঠাকুর গাইতেন

'আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।
আমার ভক্তি যে বা পায়, সে যে সেবা পায়—হয়ে ত্রিলোকজয়ী॥
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই.........
শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপগোপী বিনে অন্যে নাহি জানে!
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতাজ্ঞানে তার বোঝা মাথায় বই॥'

আহা! ঠাকুর কি ভাবের সহিতই না এ গানটি গাইতেন!" এই বলে নিজেই গানটি গাইতে লাগলেন। পরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যেন আপন মনেই বলতে লাগলেন—"ঠাকুর তো পাপীতাপীদের উদ্ধার করবার জন্মই এসেছিলেন। আন্তরিকভাবে তাঁর শরণাগত হলে তিনি তাঁর কৃপাহস্ত বুলিয়ে সব পাপ মুছে দেন। তাঁর দিব্য স্পর্শে মানুষ তখনই নিষ্পাপ হয়ে যায়। চাই তাঁর উপর আন্তরিক টান, তাঁর চরণে আত্মনিবেদন। গিরিশ বাবু তো কত কি করেছিলেন; কিন্তু তাঁর ভক্তি দেখে ঠাকুর তাঁকে কৃপা করলেন, কোলে তুলে নিলেন। তাই তো শেষ জীবনে গিরিশ বাবু বলতেন—'পাপ রাখবার অত বড় গর্ত আছে জানলে আরও অনেক পাপ করে নিতাম।' তিনি কৃপাময় কৃপাসিন্ধু।"

জনৈক দীক্ষিতা স্ত্রী-ভক্ত স্বামীর সগু মৃত্যুতে শোকাতুরা হয়ে পাগলিনীর ন্যায় অনেক বিলাপ করে চিঠি লিখেছেন। স্তব্ধ হয়ে সেই চিঠি শুনতে শুনতে মহাপুরুষজী মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন—"আহা! আর শুনতে পারছি নে।" চিঠি পড়া শেষ হলে তিনি খানিকক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করে বসে থেকে বললেন—"মহামায়া লীলা করছেন আর মানুষ শোকতাপে কষ্ট পাচ্ছে। এ সব ব্যাপার কে বুঝবে? মানুষ যদি একটু এই সব ভাবে, সংসারের অনিত্যত্ব চিন্তা করে, তবেই বাঁচে। তারা দিনরাত মায়াতে ডুবে থাকে। মাঝে মাঝে মৃত্যু চিন্তা করা ভাল। কত ভাবে যে এ জগতের নশ্বরত্ব চোখের সামনে ভেসে উঠছে তার ইয়ত্তা নেই। তবু তো জীবের চৈতন্য

হয় না! এরই নাম মায়া। ঠাকুর এ গানটি প্রায়ই ভক্তদের সামনে গাইতেন”—এই বলে খুবই কম্পিত কণ্ঠে যেন শোকে মুহ্যমান হয়ে গাইতে লাগলেন—

“এমনি মহামায়ার মায়া, রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা জানতে পারে॥
বিল করে ঘুণি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে॥
গুটিপোকায় গুটি করে, পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি, আপনার জালে আপনি মরে॥”

“মানুষ ঠিক গুটি পোকার মত। নিজে মায়ার সংসার রচনা করে তাতে বদ্ধ হয়ে শোকতাপে জ্বলে পুড়ে মরছে। যাদের ‘আমার আমার’ করছে তারা যে কেউ আমার নয়, তা বুঝবে না। একে তো দেহধারণ করাই কত কষ্টের ব্যাপার; তার উপর আবার এই মায়ার সৃষ্টি! মানুষই বা কি করবে? মহামায়ার আবরণী শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ভুগে মরছে। মহামায়ার ব্যাপার কিছুই বোঝবার জো নেই। তাঁর নাশিনী শক্তির খেলা! সেজন্য ঠাকুর বলতেন— ‘মা, তোমার লীলা কে বুঝবে? বুঝতেও চাই নে। কৃপা করে তোমার শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধ জ্ঞান দাও—এই প্রার্থনা।’ অনেক সময় ঠাকুর এ কথা বলতেন। আমি তো তাঁর কথাই বলছি। পড়ে গিয়ে ঠাকুরের যখন হাত ভেঙ্গে যায় তখন তো তাঁর বালকের মত অবস্থা। এক দিন একটি ছোট ছেলের মত ধীরে ধীরে হাঁটছেন আর মাকে বলছেন—‘মা তোমায় তো আর দেহধারণ করতে হল না। দেহধারণের কষ্ট তুমি তো বুঝলে না’!”

মহাপুরুষজী খানিক চুপ করে থেকে—"আহা! আহা! সন্ত স্বামী লোক!" এই বলতে বলতেই হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। পরে চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলেন।

বেলুড় মঠ

শুক্রবার, ১৮ই মার্চ, ১৯৩২

বিকেল বেলা জনৈক সেবক চিঠিপত্রাদি সব পড়ে শোনাচ্ছিলেন; ভুবনেশ্বরের এক চিঠিতে শ্রীশ্রীমহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত হরি মহান্তির দেহত্যাগের খবর এসেছে। অদ্ভুত মৃত্যু! শরীরত্যাগের খানিক পূর্বে মহান্তি দেখতে পেলে যে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একটি সুন্দর ফুল হাতে করে তাকে দিতে এসেছেন। মহারাজজীকে দেখেই মহান্তি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং তাঁকে প্রণাম করবার জন্য ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শারীরিক সামর্থ্যহীনতার দরুণ উঠতে পারল না। তখন পার্শ্বস্থিত একজনকে মহান্তি বল্লে—"মহারাজজীর হাত থেকে ফুলটি আমায় এনে দাও।" কিন্তু মহারাজজীকে অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। তখন মহান্তি বলল—"সে কি? ঐ যে মহারাজ দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফুল হাতে করে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? ইত্যাদি অনেক কথা বলেছিল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাত জোড় করে মহারাজকে দর্শন করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছিল। ঐ চিঠি শুনে মহাপুরুষজী অশ্রুপূর্ণলোচনে বললেন—"আহা! আহা! হরি মহান্তি মহারাজকে বড় ভক্তি করত; কত ভালবাসত! অতি চমৎকার লোক; বড় ভক্তিমান! মহারাজ

তাকে খুবই কৃপা করতেন ; তাই তো শেষ সময়ে দর্শন দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিলেন, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। মহারাজের কৃপা আর ঠাকুরের কৃপা একই। ঠাকুর যাদের কৃপা করেছিলেন তাদের তো কথাই নেই, তাঁর সন্তানেরাও যাদের কৃপা করেছেন তাদের মুক্তি নিশ্চিত ! আর কিছু না হোক, শেষ সময়েও ঠাকুরের দর্শন পাবেই। ঠাকুর ঠিক তাদের হাত ধরে নিয়ে যাবেন। স্বামিজী, মহারাজ এঁরা কি কম গা ?"

"যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁকে ভাল বেসেছে, তার মুক্তি অনিবার্য। দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের গল্প শোন নি? সে ঠাকুরকে 'বাবা বাবা' বলত। এক দিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করে বলেছিল—'বাবা, আমায় কৃপা করলে না ? আমার গতি কি হবে ;' তখন ঠাকুর বলেছিলেন—'ভয় নেই, তোর হবে ; মৃত্যুসময় আমায় দেখতে পাবি।' ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে তাকে তুলসীমঞ্চে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বেই রসিক বলে উঠল—'এই যে বাবা এসেছ—বাবা এসেছ !' এই বলতে বলতে মারা গেল।"

"ঠাকুরের সব ভক্তদের দেহত্যাগই খুব অদ্ভুত রকমের। বলরাম বাবুর দেহত্যাগের ঘটনাও অতি আশ্চর্য রকমের। তাঁর তো খুবই কঠিন অসুখ ; সকলেই মহা চিন্তিত। দেহত্যাগের দু তিন দিন আগে থেকেই আত্মীয় স্বজনদের কাউকে কাছে আসতে দিতেন না। মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আমাদেরই কেবল দেখতে

চাইতেন। আমরাই তাঁর কাছে কাছে থাকতাম। যতটুকু কথা বলতেন, তা খালি ঠাকুর সম্বন্ধে। দেহত্যাগ করার এক দিন আগেই ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেল। বলরাম বাবুর স্ত্রী শোকে খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে গোলাপ মা, যোগীন মা প্রভৃতির সঙ্গে অন্দর মহলে বসে আছেন। এমন সময় বলরাম বাবুর স্ত্রী দেখতে পেলেন, আকাশে এক খণ্ড কাল মেঘ ভেসে আসছে। পরে ঐ মেঘ ঘনীভূত হয়ে ক্রমে নীচে নেমে আসতে লাগল এবং যতই নিকটে আসতে লাগল ততই তিনি দেখতে পেলেন যে, তাতে একখানি দিব্য রথ। ক্রমে ঐ রথ বলরাম-মন্দিরের ছাদের উপর নামল এবং ঠাকুর ঐ রথ থেকে নেমে এসে বলরাম বাবু যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে ঢুকলেন। খানিক পরেই বলরাম বাবুর হাত ধরে ঠাকুর রথে এসে বসলেন। তখন সেই রথ ঊর্ধ্বে উঠে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে বলরাম বাবুর প্রাণবায়ুও বেরিয়ে গেল। এমন সব অলৌকিক ব্যাপার হচ্ছে! আজকালও অনেক ভক্তদের অদ্ভুত দেহত্যাগের খবর পাওয়া যাচ্ছে। দেহত্যাগ সময়ে কত দিব্য দর্শন, অনুভূতি হচ্ছে; ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ ছেড়ে ঠাকুরের কাছে চলে যাচ্ছে। ঠাকুরের সব ভক্তদেরই উচ্চ গতি হবে নিশ্চয়। * * *"

এর দু দিন পরে অর্থাৎ ২০শে মার্চ শনিবার রাত্রে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী* ঠাকুরের ছবি বুকে

---

* ইনি ভক্তমণ্ডলীর নিকট 'নীরোদ মহারাজের মা' নামে পরিচিতা। ইনি ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন।

জড়িয়ে ধরে তাঁর নাম করতে করতে ধ্যানস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন। সে খবর শুনে মহাপুরুষজী অনেকক্ষণ খুবই গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। পরে বল্লেন—"এঁরা সব অসাধারণ লোক, ঠাকুরের লীলাসহচর, যুগে যুগে অবতারের লীলা পুষ্ট করবার জন্য অবতারের সঙ্গে দেহ ধারণ করেন। মা ঠাকরুণ যখন বৃন্দাবনে তখন একদিন রাধা-কান্তের মন্দিরে আরতি দর্শন করতে গিয়ে দেখেন যে, নীরোদের মা রাধাকান্তজীকে চামর করছেন। পরে সঙ্গের মেয়ে ভক্তদের তিনি বলেছিলেন 'আরতির সময় দেখলাম, নবগোপাল বাবুর স্ত্রী ঠাকুরকে চামর করছে।' আহা! তাঁর কি ভক্তি, কি প্রেমই ছিল ঠাকুরের ওপর! ঠিক গোপীদের ভাব! তাঁকে ছেলেরা বলেছিল—'মা, তুমি তো খুব ঠাকুর ঠাকুর করছ; এখন তোমার ঠাকুর আমাদের কি দৈন্য দশায়ই ফেলেছে! ঢের হয়েছে, আর ঠাকুর ঠাকুর করো না।' তাতে নীরোদের মা বলেছিলেন—'বলিস্ কি রে? আমি যে তাঁকে ভালবেসেছি! আমি যে তাঁকে একবার প্রাণ দিয়েছি রে! তোরা আবার এ সব কি বলিস্ রে'!" মহাপুরুষজী খুব আবেগভরে এ কথাটিই বার বার বলতে লাগলেন। আর "আহা! আহা!" করতে লাগলেন। পরে যেন রুদ্ধকণ্ঠে বল্লেন—'অশুল্কদাসিকা'—তাঁর ভালবাসায় কেনা। তাঁর চরণে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিলেন! আহা! আমি যতই ঠাকুরের উপর তাঁর ভালবাসার কথা ভাবছি ততই আমার মনটা, বুকের ভেতরটা, গুড় গুড় করে উঠছে! আত্মপ্রীতি কাম—কৃষ্ণপ্রীতি প্রেম। নীরোদের মা একজনকে বলেছিলেন—'ভজন-সাধন কর; কিন্তু ঠিক ঠিক মরতে জানলেই সব হল।' তা

তিনি ঠিক ঠিক মরেছেন। ঠাকুরের ছবি বুকে করে, তাঁর নাম করতে করতে, ঠাকুরের কাছে চলে গেছেন।"

বেলুড় মঠ

রবিবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩২

আজ সারাদিন ধরে বহু ভক্তসমাগম চলেছে। মহাপুরুষ মহারাজ এতটুকুও বিশ্রাম করতে পারেন নি। অথচ অক্লান্ত ভাবে সকলের সঙ্গে আনন্দে ভগবৎপ্রসঙ্গাদি করছেন। সকলেই পরিতৃপ্ত প্রাণে ফিরে যাচ্ছে।

বিকেল বেলা প্রায় তিনটার সময় জনৈক সন্ন্যাসী কলকাতার একজন বিশিষ্ট ভক্তকে নিয়ে এলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিক উৎসব সম্বন্ধে কথাবার্তা হতে লাগল। সন্ন্যাসী শতবার্ষিক উৎসবের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাধারণভাবে বললেন, "এ উৎসব অনেক দিন ধরে হবে—নানাভাবে, সারা ভারতময়, শত শত স্থানে। ভারতেতর দেশ—ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও এ উৎসবের আয়োজন করা হবে। দেশ বিদেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচারই এ উৎসবের প্রধান অঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতি, কলাবিদ্যা ইত্যাদির প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করার কল্পনা আছে। দেশদেশান্তর থেকে সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণকে আমন্ত্রণ করে সর্বধর্ম সম্মেলন প্রভৃতি করার আলোচনা হচ্ছে। আর সমগ্র ভারতের একশ জন নামজাদা পণ্ডিতের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা একত্র করে শতবার্ষিকী-স্মৃতিগ্রন্থও ছাপাবার ইচ্ছা আছে। এখন

মোটামুটি এইভাবে কাজ আরম্ভ করে যেমন যেমন কাজ এগুবে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাবে, সেইভাবে আপনাদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজের প্রসার করা যাবে।"

মহাপুরুষজী শতবার্ষিক উৎসবের পরিকল্পনা শুনে খুবই খুসী হয়ে বল্লেন—"এতো অতি শুভ সংকল্প; খুবই চমৎকার হবে। নানাদেশে যুগাবতারের ভাব প্রচারিত হবে তাতে বহু লোকের কল্যাণ হবে। এখন ঠাকুরকে স্মরণ করে পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগে যাও।"

সন্ন্যাসী—"বিস্তর টাকার দরকার। সব চাইতে বড় ভাবনা যে, অত অর্থ কোথেকে আসবে।"

মহাপুরুষজী—"তা টাকাকড়ি সব এসে যাবে। তার জন্য তোমরা ভেবো না। এতো স্বয়ং শ্রীভগবানের কাজ। তাঁর কাজে কি কিছুর অভাব হয়? তাঁতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখ—অটুট বিশ্বাস। তাঁর কাজ তিনিই করবেন; আমরা নিমিত্ত মাত্র। দেখবে যে, অভাবনীয় উপায়ে সব যোগাড় হয়ে যাবে।"

অতঃপর সন্ন্যাসী খুবই কাতরভাবে বল্লেন—"মহারাজ, আপনি একটু আশীর্বাদ করুন যাতে এ বিরাট পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়।"

মহাপুরুষজী খুবই উত্তেজিত হয়ে আবেগভরে বল্লেন—"আশীর্বাদ কি হে? এ যে আমার বাবার কাজ—আশীর্বাদ কি? আমরা তো তাঁর চাকর, তাঁর দাস। আমি বলছি—নিশ্চয়ই ভাল হবে, সব সফল হবে—নিশ্চয়!" এইমাত্র বলে তিনি খুবই

গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মন যেন অন্য রাজ্যে চলে গেল। উপস্থিত সকলেই তাঁর ঐ দৃঢ় আশ্বাসবাণী শ্রবণে স্তম্ভিত হয়ে রইল। অনেকক্ষণ এই স্তব্ধতার মধ্যে কেটে যাবার পরে সন্ন্যাসী ভক্তসহ প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় মহাপুরুষজী ধীরভাবে বল্লেন—"ঠাকুরের শতবার্ষিকী-তহবিল খুলবার জন্য আমার তরফ থেকে কিছু নিয়ে যাও।" এই বলে জনৈক সেবককে দশটা টাকা দিতে বল্লেন। তিনি নিজে হাতে করে ঐ টাকা দিয়ে বল্লেন—"যাও, কিছু ভেবো না। তাঁর কৃপায় টাকাকড়ির কোন অভাব হবে না। সব শুভ হবে।"

সকলে চলে যাবার পরে মহাপুরুষজী আপন ভাবে মগ্ন হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেবকের দিকে তাকিয়ে যেন আপন মনেই বল্লেন—"ঠাকুরের শতবার্ষিকী একটা মহা বিরাট ব্যাপার হবে। এরা যা ভেবেছে তার চাইতে ঢের বেশী। 'খুব ভেবে দেখলাম—সমগ্র দেশ ঠাকুরের ভাবে মেতে উঠবে। এ শরীর তত দিন থাকবে না। কিন্তু তোমরা দেখবে কি বিরাট কাণ্ড হয়। তাঁর ইচ্ছাতেই এ সব হচ্ছে।"

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় মঠের জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী মহাপুরুষজীর ঘরে এসে তাঁকে প্রণাম করে বল্লেন—"আজ খুবই লোকের ভিড় গিয়েছে। আমি তো দিনের বেলা দু তিন বার আসবার চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু ভিড় দেখে আর আসি নি। খুবই কষ্ট হয়েছিল আপনার। শরীর কেমন আছে?"

মহাপুরুষজী—"শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করছ? অনেক সময় শরীর আছে কি না এ বোধই আমার থাকে না—সত্য

বলছি। তবে তোমরা এসে জিজ্ঞাসা করলে, যা একটা কিছু বলতে হয় বলি। তা ছাড়া অত কে ভাবে? এই তোমরা আস, ভক্তেরা আসে, ঠাকুরের কথা বলি, আর বাকী সময় তাঁর দয়ার কথা ভাবি—ওতেই আনন্দ। আমি তো তাঁর কাছে যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছি; কিন্তু তিনি যে কেন এখনও ডাকছেন না তা তিনিই জানেন। এক এক সময় ভাবি যে তাঁর একি অদ্ভুত লীলা! অমন স্বামিজী—তাঁকে কত অল্প বয়সে নিয়ে গেলেন। অথচ তিনি থাকলে তাঁর কত কাজই না হত। অমন মহারাজ ছিলেন—তাঁকেও নিয়ে গেলেন। অথচ আমাকে এখনও ফেলে রেখেছেন তাঁর কাজের জন্য। আমি তো ওঁদের তুলনায় কিছুই নই। তিনিই জানেন, তাঁর কি ইচ্ছা। আমাকে একলা ফেলে রেখেছেন; আর আমায় কত ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে। ঠাকুরের সন্তানরা এক একজন চলে যান, আর মনে হয় যেন বুকের এক একটি পাঁজর খসে যায়। অথচ সবই সইতে হচ্ছে। কাকেই বা আর বলব?"

সন্ন্যাসী—"মহারাজ, আপনি যত দিন আছেন আমাদেরই কল্যাণ। কত শত ভক্ত আসছে শান্তি পাবার জন্য; আর আমরাও আপনি আছেন বলে নিশ্চিন্ত আছি। ঠাকুরের সঙ্ঘ-শক্তি এখন আপনাকে কেন্দ্র করেই কাজ করছে। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তো চলে গেছেন; আমাদের পরিচালনার জন্য এখন ঠাকুর আপনাকে রেখেছেন।"

বেলুড় মঠ

২৭শে এপ্রিল, বুধবার, ১৯৩২

আমেরিকা হতে প্রকাশিত 'এশিয়া' মাসিক পত্রিকাখানি পড়তে পড়তে রাশিয়ায় আইন করে বেকারগিরি বন্ধ হওয়ার খবরে খুবই আনন্দ প্রকাশ করে মহাপুরুষ মহারাজ বল্লেন— "বাঃ! বেশ হয়েছে। এসব শুনেও কত আনন্দ হয়। আহা, ভারতবর্ষে কি দুর্দশা শ্রমিকদের! পরাধীন দেশে কে ভাবে গরীবদের জন্য? তাদের কি কখনও সুদিন আসবে না? ঠাকুর, এদের একটা গতি কর! তুমি তো দীনজনের জন্যই এসেছিলে।" এই বলতে বলতে আবেগভরে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। পরে বল্লেন—"তা হবে। শীঘ্রই এর একটা উপায় হবে। স্বামিজী বলেছিলেন যে, এবার শূদ্রশক্তির জাগরণ। তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। সারা পৃথিবীর শ্রমিকদের ভেতর নবজাগরণের সূচনা হয়েছে; ভারতবর্ষও বাদ যাবে না। কোন বহিঃশক্তি এ অভ্যুত্থানকে রোধ করতে পারবে না; কারণ এর পেছনে রয়েছে ঐশী শক্তি— যুগাবতারের সাধনা। ঠাকুরের শক্তি কত ভাবে কত দিকে খেলা করবে, তা একমাত্র জেনেছিলেন স্বামিজী; আর কেউ তা বুঝতে পারে নি। ঠাকুরের দেহত্যাগের পূর্বে তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি স্বামিজীর ভেতর সংক্রামিত করে দিয়ে বলেছিলেন—'আজ তোকে সব দিয়ে ফতুর হলুম।' আর যুগধর্ম প্রচারের সমস্ত ভারও দিয়েছিলেন স্বামিজীর ওপর। স্বামিজীও সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জগতের হিতের জন্য কাজ করে গেছেন। যে

ভাবধারা তিনি জগতে রেখে গেছেন, সে সকল ভাব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে নানা আধারের ভেতর দিয়ে ক্রমে ফলপ্রসূ হবে এবং সমগ্র জগতে সর্বাঙ্গ সুন্দর উন্নতি সাধন করবে নিশ্চয়।”

একটী দীক্ষিত বালকভক্ত এসে প্রণাম করলে তিনি সস্নেহে তাকে সামনে বসতে বললেন এবং কুশলপ্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করলেন—“নিয়মিত জপ করিস্ তো? খুব করবি। জপ করতে ভুলিস নি—বুঝলি? ঠাকুর যুগাবতার; তাঁর নাম করতে করতে প্রাণে কত আনন্দ পাবি। প্রাণভরে প্রার্থনা করবি—‘প্রভু, আমি বালক; কিছুই জানি নে। তুমি দয়া কর—ভক্তিবিশ্বাসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করে দাও। আর তোমার স্বরূপ যে কি তা বুঝিয়ে দাও।’ তা হলেই সব হবে। খুব ডাকবি কাতর প্রাণে। গুরু তোর দিকে সস্নেহে চেয়ে আছেন, আর তুই তাঁর দিকে প্রেমভরে চেয়ে আছিস্, এই ভেবে ধ্যান করবি। এক দিনে সব ঠিক হয় না। সরল প্রাণে করে যা; ক্রমে হবে।” পরে ছেলেটীকে ঠাকুরের প্রসাদী ফল মিষ্টান্নাদি সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন। সে হাতমুখ ধুতে ছাদের ওপর গেলে মহাপুরুষজী বল্লেন—“ছেলেটির লক্ষণ ভাল। এর হবে। আমরা লোক দেখলে বুঝতে পারি। ঠাকুর আমাদের এ সব অনেক শিখিয়েছিলেন। খালি বাইরে দেখতে শুনতে ভাল হলেই হয় না; ভক্তের লক্ষণ আলাদা।”

জনৈক ভক্ত প্রণাম করে প্রার্থনা জানালেন—“মহারাজ, ধ্যানজপ তো করে যাচ্ছি; কিন্তু তেমন আনন্দ পাচ্ছি নে। আর

মনও স্থির করতে পারছি নে। দয়া করে আশীর্বাদ করুন; আর কি করলে আনন্দ পাব তার উপায় বলে দিন।”

মহাপুরুষজী সস্নেহে বল্লেন—“ধ্যানজপে আনন্দ কি বাবা অত সোজা? অনেক সাধনায় তা হয়। খুব খাটতে হবে। মন শুদ্ধ হওয়া চাই। ভগবানের উপর যত আপনার বোধ বেশী হবে, আর তাঁকে যত বেশী ভালবাসতে পারবে, ততই বেশী আনন্দ পাবে তাঁর নামে। নাম-নামী অভেদ। তিনি প্রেমময়, আনন্দময়; তাঁকে যত বেশী ভাববে তত বেশী আনন্দ পাবে। মন স্থির না হলে কিছুই হবে না। ধ্যানজপ, প্রার্থনা খুব করে যাও। দেখবে ক্রমে শরীর মনে এক নূতন বল পাবে; ক্রমে রুচি আসবে তাঁর নামে। মন তো সাধারণতঃ নানা বিষয়ে ছড়িয়ে থাকে। সেই ছড়ান মনকে কুড়িয়ে এনে ধ্যেয় বস্তুতে লাগাতে হবে। খুব প্রার্থনা কর। প্রার্থনা বড় সহায়ক জিনিস। যখন জপধ্যান করতে পারছ না দেখবে, তখনই খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করবে। আর মাঝে মাঝে এখানে এস, সাধুসঙ্গ করো; তাতে মনে খুব বল পাবে। সাধুদের কাছে এসে ভক্তিভরে ভগবৎপ্রসঙ্গ করবে। নইলে বাজে কথা বললে তাতে তোমারও কিছু লাভ হল না, আর সাধুরও সময় নষ্ট হল। আসল কথা হচ্ছে—ধ্যানজপ, প্রার্থনা, স্মরণ মনন, সৎ গ্রন্থাদিপাঠ, ভগবৎ-প্রসঙ্গ এই সব করে নানাভাবে ভগবানকে নিয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা, একটা কাজ কর দেখি; যাও এক্ষণই ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের দিকে চেয়ে খুব প্রার্থনা কর। বল—‘ঠাকুর তুমি আমায় রক্ষা কর; আমি নিরাশ্রয়, অজ্ঞান। প্রভু, তুমি দয়া কর,

কৃপা কর, আমায় বল দাও। তোমারই এক সন্তান আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।' এইভাবে খুব কাতর প্রার্থনা কর। তিনি কৃপা করবেন, তোমার প্রাণে আনন্দ দেবেন।"

বিকেল বেলা চিঠিপত্রাদি পড়া হচ্ছিল। জনৈক ভক্তের চিঠি শুনে বল্লেন—"এই ঠিক। এই ব্যাকুলতা ঠিক ঠিক হলে আর ভাবনা কি? লিখে দাও—'খুব কাঁদ, খুব ডাক, খুব জ্বালা যন্ত্রণা বোধ কর, জ্বলে পুড়ে মর—তবে তো হবে।' ঠাকুর বলতেন যে, লোকে মাগ ছেলের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে কিন্তু ভগবানের জন্য ক জন কাঁদে? ভগবান লাভ হল না বলে যে কাঁদে সে তো মহা ভাগ্যবান। তার উপর ভগবানের কৃপা হয়েছে নিশ্চয়। শান্তিলাভ কি সোজা কথা? তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হলে শান্তি কোথায়? তাঁতে যখন মন সমাধিস্থ হয় তখনই প্রকৃত শান্তি; তার পূর্বে নয়। হঠাৎ তো হবার জিনিস নয়; লেগে থাকতে হবে—খানদানি চাষার মত।"

একটি ভক্ত প্রার্থনা জানিয়ে লিখেছেন যে, যেন এ জন্মেই ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়। তদুত্তরে তিনি বল্লেন—"লিখে দাও, 'বাবা, তোমার মনে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিবিশ্বাস লাভ করার জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা হয়েছে, তাতে খুবই আনন্দিত হলাম। তাঁর কাছে খুব কাতর প্রার্থনা জানাও। তিনি অন্তর্যামী। তিনি জানেন, তাঁর ভক্তকে কখন কি দিতে হবে। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়ে পড়ে থাক। প্রকৃত ভক্ত এ জন্ম সে জন্ম গ্রাহ্য করে না। এতো অতি নীচু কথা। যাতে পূর্ণ বিশ্বাস ভক্তি প্রেম হয়, তাই ঠাকুরের

কাছে জানিয়ো। এ জন্মের সে জন্মের কথা জানিয়ো না। তুমি বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেমে ভরপুর হয়ে যাও—এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ঠিক ঠিক ভক্তের প্রার্থনা হবে—

এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো, নরকে বা নরকান্তম্ প্রকামম্। অর্থাৎ—এই আমার একান্ত প্রার্থনা যে, স্বর্গ, মর্ত্য বা নরক যেখানেই বাস হোক না কেন, হে নরক নিবারণকারি, জন্মজন্মান্তরে যেন তোমার পাদপদ্মযুগলে আমার অচলা ভক্তি হয়। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভ হলে তখন সবই স্বর্গ—সবই আনন্দময়। তোমার তাই হোক তাঁর কৃপায়।”

অপর একজন ভক্তের চিঠির জবাবে লিখতে বললেন—“প্রভুকে যে চায় সেই পায়। তবে ঠিক ঠিক চাওয়া চাই। ডাকার মত ডাকতে হবে, তবেই তিনি দর্শন দেবেন। ঠাকুর বলতেন, ‘ভগবান যেন চাঁদামামা, সকলেরই মামা। যে চায় সেই পায়।’ প্রভুর বিরহে তাঁকে না পাবার দরুণ কাঁদতে কেউ কাউকে শেখাতে পারে না; উহা আপনা আপনিই আসে সময়ে। * * * তাঁর জন্য প্রাণে যখন ঠিক ঠিক অভাব অনুভব হবে, ভগবান লাভ হচ্ছে না বলে যখন প্রাণ ছট্‌ফট্ করবে, তাঁর বিরহে যখন জগৎ শূন্য দেখবে, তখনই বুক ফেটে কান্না আসবে। সে সৌভাগ্য কখন আসবে তা কেউ জানে না। তাঁর কৃপা হলেই সে অবস্থা হবে এবং তুমি হৃদয়েই তা অনুভব করবে। খুব ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক, খুব প্রার্থনা কর—প্রভু কৃপা কর, কৃপা কর

বলে। তিনি তোমার প্রার্থনা শুনবেন—আমি বলছি। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। আন্তরিক প্রার্থনা করছি, প্রভু তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

বেলুড় মঠ

বৃহস্পতিবার, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৩২

জনৈক সন্ন্যাসী উত্তরকাশীতে তপস্যা করতে গিয়ে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং ওখানকার নানা অসুবিধার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। মহাপুরুষজী চিঠির জবাবে তাঁকে লিখতে বল্লেন— "ওখানে অসুখে ভোগার চাইতে সত্বর এদিকে চলে এস। উত্তর-কাশীতেই যে মুক্তিলাভ হবে এমন তো কোন কথা নেই? সব জায়গায়ই মুক্তি হতে পারে, সমাধি লাভ হতে পারে, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, তাঁর কৃপা হয়। দেখলে তো এতদিন ওখানে থেকে। এখন এদিকেই চলে এস এবং এদিকেই সাধনভজন যেমন করছিলে তেমনি কর। আসল কথা তো হল তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভ করা, তা এখানে এসেও হতে পারে। অনেক সাধুর ও সব জায়গা সহ্য হয় না— রোগে ভুগে ভুগে অকালে মারা যায়, কিম্বা বেশী কঠোরতা করতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সব বাবা, তাঁর ইচ্ছা। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক। নিরন্তর তাঁকে ডাক, প্রার্থনা কর। ক্রমে তাঁর কৃপা হৃদয়ে উপলব্ধি করবে। সমাধি না হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, আবার সে সমাধিলাভও তাঁর কৃপা ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ করা। তা কোন স্থান-

বিশেষের জন্য অপেক্ষা করে না। স্বয়ং ঠাকুরের জীবনেই দেখ না। তিনি তো তপস্যা করতে উত্তরকাশীও যান নি বা হিমালয়েও ঘুরে বেড়ান নি। তাঁর জীবনকে আদর্শ করে চলতে হবে। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি কাজই এ যুগের আদর্শ। ঐ হল সব চাইতে পাকা নজির।”

একজন ব্রহ্মচারী বৈরাগ্য হওয়ায় একেবারে হিমালয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে তপস্যা করবার জন্য। সে সম্বন্ধে মহাপুরুষজী বল্লেন—“বাবা অত ঘোরাঘুরি ভাল নয়। ওতে কিছু হয় না। অবশ্য একেবারে কিছু হবে না কেন? কিছুটা হয়। তবে ও সব সাময়িক; তার ফল খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। আসল কথা, স্থায়ী কিছু লাভ করতে হলে আমাদের ঠাকুর স্বামিজীর মঠে বসে ভজনসাধন করতে হবে। ঐ জন্যেই তো স্বামিজী বুকের রক্ত দিয়ে মঠ করে গেছেন। এত সাধু-সঙ্গ! এমন সব সাধু পাবে কোথায়? এমন শুদ্ধ, পবিত্র, বৈরাগ্য-বান, বিদ্বান, মুমুক্ষু সাধুসঙ্গ মেলা দুর্লভ। তা ছাড়া এখানে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ সব রয়েছে। সাধনভজনের এমন অনুকূল স্থান আর কোথাও নেই। যাদের ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হয় তারা কি অত জায়গা বেছে বেছে ঘুরতে পারে? এক জায়গায় চুপচাপ বসে পড়ে। হিমালয়ে কোথাও কোথাও বেশ ভাল সাধু, বৈরাগ্যবান তপস্বী দু একজন আছেন। তাঁরা খুব নিভৃত স্থানে থাকেন। আর বাকী সব বেশীর ভাগই কোন রকমে দিন কাটায়। হরি মহারাজ তাই তো বলতেন—‘আমরা তো চোর। সর্বক্ষণ কি সাধনভজন নিয়ে থাকতে পারি? অনেক সময় বাজে নষ্ট হয়। তার চাইতে একটু একটু সেবা কাজ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভজনসাধন করা ভাল।’ ঘোরাঘুরি, কঠোরতা এ সব আমরাও তো কম করি নি? জীবনে

সে সব অভিজ্ঞতা ঢের হয়েছে। হিমালয়ে, পাহাড় জঙ্গলে, যেখানেই গেছি ধ্যানজপ খুবই করতাম। দেখেছি, প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির জ্ঞান আর কতক্ষণ থাকত? বেশীক্ষণ নয়। মন যখন নির্বিষয় হয়ে ধ্যেয় বস্তুতে মগ্ন হয়ে যেত তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বোধই থাকত না। দেশকালের জ্ঞান যখন লুপ্ত হয়ে যায় তখন তো এক আনন্দ—সচ্চিদানন্দঘন। ভেতরে সব জায়গায়ই এক রকম। বাইরে আর কি সৌন্দর্য আছে? কিছুই নয়। সব সৌন্দর্যের খনি তো ভেতরেই। যা ব্যক্ত হয়েছে তা তো সসীম, তার ইতি করা যায়; কিন্তু যা অব্যক্ত তা অসীম। যতই অন্তরতম প্রদেশে মন প্রবেশ করবে ততই মন তাতে মগ্ন হয়ে যাবে। 'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।'* তিনি কত বিরাট! তাঁতে মন একবার লিপ্ত হয়ে গেলেই বাস্। তখন মন আর বাহ্যিক কোন কিছুতেই আনন্দ পায় না। সব শান্তির আকর তো তিনিই। তাঁকে দর্শন না করতে পারলে মানব জীবনই বৃথা। ভগবদ্দর্শন না হলে কিছুই হল না।"

* পরম পুরুষের এক পাদে সমগ্র জগৎ সংসার অভিব্যক্ত হয়েছে। অব্যক্ত তিন পাদ সৃষ্টির ঊর্ধ্বে অমৃতস্বরূপে বিদ্যমান আছে।

বেলুড় মঠ

শনিবার, ২১শে মে, ১৯৩২

বিকেল বেলা। জনৈক ভক্ত সাধনভজনে মন স্থির করতে পারছেন না বলে খুব নৈরাশ্যের ভাব জানিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে বল্লেন—"মহারাজ, চেষ্টা তো করছি; কিন্তু মন স্থির হয় না। কি করা যায়, দয়া করে বলুন। আমার কি কিছুই হবে না?"

মহাপুরুষজী দৃঢ়ভাবে বল্লেন—"বাবা, দেড় মাস তো আরও ছুটি রয়েছে! যেমনটি বলেছি তা করেই দেখ না। অল্লেতেই এত হতাশ হলে চলবে কেন? শ্রদ্ধা চাই, ধৈর্য চাই। লেগে পড়ে থাকতে হবে। একটুতেই কিছু হচ্ছে না বলে হা-হুতাশ করলে কি হবে? মন স্থির করবার বা ভগবদানন্দ পাবার কোন কৃত্রিম উপায় বাবা, কিছু জানি নে। আমি যে উপায় জানি, যা ঠাকুরের কাছে শিখেছি, তা তোমায় বলেছি। আর এও বলছি যে এ পথে চট্ করে কিছু হবার নয়। নিয়মিত ভাবে নিষ্ঠার সহিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এক ভাবে লেগে থাকতে হবে—ভজনসাধন করে যেতে হবে। যে মন এত কাল নানা বিষয়ে ছড়িয়ে রয়েছে সে মনকে ধীরে ধীরে কুড়িয়ে এনে ভগবচ্চরণে মগ্ন করতে হবে। ঠাকুরকে ডাক; আর লেগে পড়ে থাক। ক্রমে মন স্থির হবে, আনন্দ পাবে। একটা শক্তি মান তো? তোমাদের পক্ষে ভগবানের সগুণ, সাকার ভাবই ভাল। তাতে সহজে মন স্থির করতে পারবে। আমি পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে যেতাম। পরে যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এলাম তখন তিনি

এক দিন জিজ্ঞাসা করলেন—'তুই শক্তি মানিস্?' আমি বল্লাম যে, আমার নিরাকারই ভাল লাগে; তবে এও মনে হয় যে, একটা শক্তি সর্বত্র ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। পরে তিনি কালীঘরে গেলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। তিনি তো মন্দিরের দিকে যেতে যেতেই ভাবস্থ হয়ে পড়লেন এবং মায়ের সামনে গিয়ে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। আমি একটু ফাঁপরে পড়ে গেলাম। কালীমূর্তির সামনে প্রণাম করতে প্রথমটায় মনে একটু দ্বিধা বোধ হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যে, ব্রহ্ম তো সর্বব্যাপী; তা হলে তিনি তো এ মূর্তির ভেতরও রয়েছেন; অতএব প্রণাম করতে তো কোন আপত্তি নেই। এই মনে হওয়া মাত্রই আমিও প্রণাম করলাম। তার পর ঠাকুরের কাছে যত যাতায়াত করতে লাগলাম ততই আস্তে আস্তে সাকারে খুব বিশ্বাস হয়ে গেল। আমার মহাভাগ্য যে, ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করেছি, তাঁর কৃপা পেয়েছি।"

বেলুড় মঠ

সোমবার, ৩০শে মে, ১৯৩২

পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের ব্যবস্থা হয়েছে এবং পাশ্চাত্য দেশবাসীরা ভারতবাসীদের অপেক্ষা ঢের বেশী সুখে আছে—এই প্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ বল্লেন—"ও সব সুখ তো ক্ষণিক সুখ। ওতে আছে কি? ওরা ভগবদানন্দের আস্বাদ কখনও পায় নি বলে ঐ ক্ষণিক আনন্দে মত্ত হয়ে আছে।

বাবা, যে যাই বলুক, কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই। তা স্বর্গেই থাক, আর যেখানেই থাক—বিদ্বানই হও আর যাই হও; কাম-কাঞ্চনে সুখ নেই, নেই, নেই। এ ভগবানের কথা। ছান্দোগ্য উপনিষদেও বলেছে—

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি······' *

আসল সুখ সেই ভূমা বস্তুতে। তাই জানতে হবে। বিজ্ঞান সেই ভূমার সন্ধান দিতে পারে নি। বিজ্ঞান নাড়াচাড়া করছে জড় বস্তু নিয়ে, জাগতিক জিনিস নিয়ে। জাগতিক ভোগ করতে করতে ভোগস্পৃহা দিন দিনই বাড়তে থাকে। তাতে তৃপ্তি কোথায়? তাতে শান্তি কোথায়? ভোগের ভেতরেই তো অশান্তির বীজ।

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥' ¶

পরে জীবনে শান্তিলাভ করার প্রসঙ্গে বললেন—"অনাত্ম বস্তুতে শান্তি নেই। আত্মজ্ঞান লাভেই প্রকৃত শান্তি। আর সেই শান্তির সন্ধানও করতে হবে ভেতরে। শান্তি ভেতরেই

* যে বস্তু ভূমা তাতেই সুখ; অল্প (অনিত্যবস্তু) তে সুখ নেই। ভূমাই শাশ্বত সুখস্বরূপ। ভূমারই অন্বেষণ করতে হবে।

¶ কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা কখন কামনার শান্তি হয় না, বরং ঘৃতনিক্ষেপ দ্বারা যেমন অগ্নি অধিকতর সতেজ হয়ে উঠে, সেই রকম কামনা ভোগের দ্বারা আরও বেড়ে যায়।

আছে, বাইরে নেই। জ্ঞান, ভক্তি, ভগবৎ প্রেম—সব ভেতরে। সাধনভজন কর, ভগবানকে ডাক। বাবা, শান্তি তিনি ভেতরেই দেবেন নিশ্চয়।"

রাত্রে দীক্ষা সম্বন্ধে বললেন—"দীক্ষা অনেক রকম। সকলকে যে জপের মন্ত্র নিতে হবে এমন কি কথা আছে? সকলের ভাব তো আর এক রকম নয় আর আধারও সব ভিন্ন ভিন্ন। অবশ্য সাধারণ গুরুরা এ সব পার্থক্য বুঝতে পারে না। কারও সাকার ভাল লাগে, কারও নিরাকার। সাকার নিরাকারের মধ্যেও আবার অনেক রকম আছে। কারও ধ্যান ভাল লাগে—সে ধ্যান করবে: কারও জপ ভাল লাগে—সে জপ করবে। কাউকে আবার ধ্যান জপ দুই করতে হবে। কার কি ভাব, কার কি ঘর, তা জেনে তবে সে ভাবে সাধককে উপদেশ দিতে হয়। নইলে সব এক ছাঁচে ফেলে দিলে তাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে বিলম্ব হবে নিশ্চয়।"

সাধুভক্তদের ঘোরাঘুরি করা সম্বন্ধে বল্লেন—"দেখ, ভক্তদের বেশী ঘুরে বেড়ান ভাল নয়। তাতে ভক্তিলাভের হানি হয়। তাই একটু আধটু ঘুরে চুপচাপ এক জায়গায় বসে ভজনসাধন করতে হয়। তাতে ভাবভক্তি জমে। বেশী ঘোরাঘুরি করলে ভাব শুকিয়ে যায়। অবশ্য পরিব্রাজক অবস্থা আলাদা। তখন একটা ব্রত নিয়ে থাকতে হয়।"

বেলুড় মঠ

১৯৩২

আজকাল মহাপুরুষ মহারাজ অহোরাত্র এক অনির্বচনীয় দিব্য-ভাবে অবস্থান করছেন। কথনও কথনও সেই ভাবের এতই আতিশয্য হয় যে, এমন কি সারা রাতই ভাবের ঘোরে বিনিদ্র অবস্থায় কেটে যায়। শরীরের দিকে মোটেই লক্ষ্য নেই। সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে বালকের মত মধুর হাসি হেসে বলেন—"আরে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে? যতক্ষণ ঠাকুর তাঁর কাজের জন্য রাখবেন ততদিন এ শরীর যে করেই হোক থাকবেই।" দীর্ঘকাল নিদ্রা না হলে শরীরের পক্ষে তো উহা মহা ক্ষতিকর হতে পারে, এরূপ বললে বলেন—"যোগীদের আবার ঘুমের প্রয়োজন কি? মন সমাধিস্থ হলে আর ঘুমের দরকার হয় না। তা ছাড়া ধ্যানেরই এমন একটা অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মন উঠলে শরীরের সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। সুষুপ্তির পরে যেমন শরীর বেশ সতেজ বোধ হয় তার চাইতেও বেশী সতেজ বোধ হয় ঐ ধ্যানের অবস্থায়। আর একটা অব্যক্ত আনন্দে সমস্ত দেহ মন ভরে যায়। আমি তো যখনই শরীর ক্লান্ত বোধ করি তখনই শরীর থেকে মন তুলে নিয়ে ঐ ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে থাকি—বাস, আনন্দম্! ঠাকুরকে দেখেছি—তিনি প্রায়ই ঘুমুতেন না; কথনও বড় জোর এক আধ ঘণ্টা। তিনি তো অনেক সময় সমাধিস্থ হয়েই থাকতেন। আর বাকী সময় তাঁর ভাবাবস্থায় কেটে যেত। রাত্রিতেই যেন তাঁর ভাবের আধিক্য হত। সারা রাত

মায়ের নাম করে, হরিনাম করে, কাটিয়ে দিতেন। আমরা দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুরের কাছে রাত্রে থাকতুম তখন খুবই ভয়ে ভয়ে থাকতে হত। তাঁর আদৌ ঘুম নেই। যখনই ঘুম ভেঙ্গে যেত শুনতে পেতাম, তিনি ভাবাবেশে মার সঙ্গে কথা কইছেন, কিম্বা বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। কখনও রাত দুপুরেই আমাদের ডাকতেন—'হাঁ রে, তোরা কি ঘুমুতে এখানে এসেছিস্? সারা রাত যদি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিবি তো ভগবানকে ডাকবি কখন?' তাঁর গলার শব্দ পেলেই আমরা ধড়মড় করে উঠে ধ্যান করতে বসতাম।"

কিছুদিন মহাপুরুষজীর একটি বিশেষ অবস্থা এসেছিল। যত লোকই তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে আসত সকলকেই তিনি করযোড়ে ভক্তিভরে প্রণাম করতেন। মঠের প্রবীণ বা নূতন সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরনারী, বালকবালিকা, দর্শনাকাঙ্ক্ষী সকলকেই তিনি দেখামাত্রই আগে যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে পরে কুশল প্রশ্নাদি করতেন। তাতে সাধুভক্তগণ সকলেই হতভম্ব ও খুব অভিভূত হয়ে যেত। আর যত সাধুভক্তই আসতেন তাঁকে দর্শন করতে, সকলকে কিছু না কিছু না খাইয়ে তিনি তৃপ্ত হতে পারতেন না। বিশেষ করে কুমারী ও বালক নারায়ণদের ফল মিষ্টান্নাদি পরিতোষ করে খাওয়ান চাই-ই।

একদিন রাত্রি তখন দুটো। বিশ্বপ্রকৃতি শান্ত, নিস্তব্ধ। মহাপুরুষজীর ঘরে একটি সবুজ রঙের আলো জ্বলছিল। তিনি বিছানায় সুখাসনে উপবিষ্ট। সারারাত দুজন সেবক পালা-ক্রমে মহাপুরুষজীর কাছে থাকেন এবং যখন যা সেবার প্রয়োজন

হয় তা করেন। রাত দুটোয় সেবকদের পালা বদলাবার সময়। সে সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সেবক বিছানার পাশে আসতেই তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে?" সেবক নাম বললে অমনি মহাপুরুষজী করযোড়ে তাকে প্রণাম করলেন। সেবক তাঁরই দীক্ষিত শিষ্য; অতএব নিজের গুরু তাকে এই ভাবে প্রণাম করায় তার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগল। সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে আবেগভরে হাত জোড় করে বলল—"মহারাজ, আপনি আমায় প্রণাম করলেন কেন? আমি যে আপনারই চরণাশ্রিত। এতে যে মহারাজ আমার মহা অকল্যাণ হবে।" সেবকের এরূপ কাতরোক্তিতে মহাপুরুষজী একটু বিচলিত হয়ে গাঢ়স্বরে বললেন—"দুঃখ করিস নি বাবা। এতে তোর কোন অকল্যাণ হবে না। আমি বলছি; আমার কথা বিশ্বাস কর। তোর প্রাণে যে খুব কষ্ট হয়েছে তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করি বল? আমি যে তোর ভেতর 'নারায়ণ' দেখতে পাচ্ছি। আমি কি তোকে প্রণাম করছি? তোর ভেতর যে ভগবান রয়েছেন তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখে প্রণাম করছি। তোরা ভাবিস যে তোদের প্রণাম করি। তা নয়। ঠাকুর যে আমায় কত ভাবে কৃপা করছেন, কত কি দেখাচ্ছেন—তা আর কি বলব।" এই মাত্র বলেই চুপ হয়ে গেলেন।

অন্য এক সময় জনৈক সেবক সকলকে তাঁর প্রণাম করবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মহাপুরুষজী বলেছিলেন—"যখনই লোকজন সামনে আসে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পাই; তাই সেই সেই দেবতাদের প্রণাম করি।

কোন লোক সামনে এলেই প্রথমটা তার ভেতরকার যা সত্তা সেই সত্তা অনুসারে কোন ঈশ্বরীয় জ্যোতির্ময় রূপ সামনে আবির্ভূত হয়। লোকজন যেন ছায়ার মত অস্পষ্ট আর ঈশ্বরীয় রূপই স্পষ্ট ও জীবন্ত দেখায়। তাই তো প্রণাম করি। প্রণাম করার পরে ঈশ্বরীয় রূপ অন্তর্ধান হয়। তখন লোকজন স্পষ্ট দেখতে পাই, চিনতেও পারি।"

সেবক—"মহারাজ, আপনি তো দিব্য দৃষ্টিতে সকলের ভেতর ভগবান দর্শন করে সকলকে প্রণাম করেন, কিন্তু আমরা তো আর তা বুঝতে পারি নে। আমাদের মনে হয় যে, এ আবার কি ব্যাপার! কোথায় আপনাকে সকলে প্রণাম করতে আসে, না আপনিই সকলকে প্রণাম করেন। সাধুভক্তদের মনে তাতে খুবই দুঃখ হয় এবং মনে নানা রকমের খট্‌কা ওঠে। আর অনেকে অনেক রকম ভাবেও।"

মহাপুরুষজী—"তা ভাবলেই বা। আমি কি আর এ সব নিজে করি? কেন যে করি তা অনেক সময় নিজেই বুঝতে পারি নে; অবাক্ হয়ে যাই। তা অন্যে এর কি বুঝবে? এর ভেতর ঠাকুর ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি, যেমন বলাচ্ছেন তেমনি বলি। ঠাকুর যে এ শরীরটাকে আশ্রয় করে কত লীলাই না করছেন তা কাকে বলি আর কেই বা বুঝবে? তোমরা তো সব ছেলেমানুষ—বালক। এ সময় মহারাজ, হরি মহারাজ বা শরৎ মহারাজ যদি থাকতেন তো তাঁরা এ সব ঠিক বুঝতেন; আর আমিও তাঁদের কাছে প্রাণের কথা বলে শান্তি পেতাম। আ তাঁর যেমন

ইচ্ছা তেমনই হবে। তাঁর পাঁঠা, তিনি ঘাড়েও কাটতে পারেন আবার ল্যাজেও কাটতে পারেন। এখন দিন দিন শরীরের কর্ম যত কমে যাচ্ছে ততই ভেতরের কর্ম বেড়ে যাচ্ছে। এ ভাবে যে এ শরীর আর কত দিন থাকবে তা তিনিই জানেন।"

বেলুড় মঠ

২৩শে জুন, বুধবার, ১৯৩২

আজ সকাল হতেই বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। মহাপুরুষ মহারাজের খুবই আনন্দ। হাত জোড় করে জগন্মাতার উদ্দেশ্যে বলছেন—"মা, তুমি না বাঁচালে তোমার সৃষ্টি কি করে বাঁচবে? বৃষ্টির অভাবে যে সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল!" পরে তাঁর নির্দেশমত পাশের ছাদের উপর পায়রা, শালিক ও চড়ুই পাখীদের চাল দেওয়া হল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা এসে খাচ্ছে দেখে মহাপুরুষজীর ভারি ফুর্তি। আর বল্লেন—"আমি তো আর বাইরে যেতে পারি নে; আমার এতেই খুব আনন্দ।"

দুপুর বেলা খানিক বিশ্রামান্তে চুপচাপ তক্তাপোষের উপর বসে আছেন—অন্তর্মুখ ভাব। পরে জনৈক সেবককে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে বল্লেন। উদ্ধব-সংবাদ পড়া হতে লাগল। দ্বাদশ অধ্যায়ে সৎসঙ্গমাহাত্ম্যে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলছেন—

'ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এবচ।'
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥ ১

ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাঽবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহোহি মাং॥' ২

—হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, লৌকিক ধর্মাচরণ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত, দান দক্ষিণা, ব্রত যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তীর্থসেবাদি, যম, নিয়ম প্রভৃতি কোন ক্রিয়াদ্বারাই মানুষ আমাকে তেমন বশীভূত করতে পারে না, যেমন সর্বপ্রকার আসক্তি নিবারক সৎসঙ্গ আমাকে আকৃষ্ট করে, অর্থাৎ আমার সান্নিধ্যলাভ করাতে সক্ষম হয়।'

'যথাঽবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহোহি মাং' শুনে মহাপুরুষজী তদ্গতভাবে বল্লেন—"আহা! আহা! কি সুন্দর কথা! দেখেছ, স্বয়ং ভগবান বলছেন যে, সাধুসঙ্গের তুলনা নেই। সাধুসঙ্গের ফলে সর্বসঙ্গাপহ অর্থাৎ সব আসক্তি-বর্জিত অবস্থা লাভ হয়ে যায়। সব কামনা বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়, আর তখন শ্রীভগবানের সান্নিধ্য অনুভূত হয়। মানুষ তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে সাধনভজন কতটা করবে? তা ছাড়া ভজনসাধন বা তপস্যা দ্বারা কি তাঁকে ধরা যায়? ভগবান ভক্তবৎসল। তিনি একমাত্র প্রেম ও ভক্তিতে তুষ্ট হন। যেখানে ব্যাকুলতা ও অনুরাগ সেখানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তো ঠাকুর বলেছেন—'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। সাধনভজন, ত্যাগতপস্যাদির দ্বারা চিত্ত নির্মল হয়; আর সেই বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবদ্ভক্তির স্ফুরণ হয় এবং শ্রীভগবান প্রকাশিত হন। আসল কথা হল, আপনার জ্ঞানে তাঁকে ভালবাসা। গোপীরা জানত 'আমাদের কৃষ্ণ'। কী আপনার বোধ! সেখানে ভগবদ্বুদ্ধি নেই, মুক্তিকামনা পর্যন্ত

নেই; আছে কেবল অহৈতুকী ভালবাসা ও শুদ্ধা ভক্তি।"

"আর সাধুসঙ্গের এমনই মাহাত্ম্য যে, সাধুসঙ্গের ফলে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়। প্রকৃত সাধু কে? যাঁর হৃদয়ে শ্রীভগবান প্রতিষ্ঠিত। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে ঠিক ঠিক সাধুসঙ্গ ও সাধুকৃপা লাভ হয়। তোমাদেরও জন্মজন্মান্তরের অনেক পুণ্য যে, ঠাকুরের এ পবিত্র সঙ্ঘে এসে পড়তে পেরেছ। সৎসঙ্গের ফলে মানুষের সমগ্র জীবনের গতি একেবারে বদলে যায়। আর তার ফলও খুবই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আমাদের জীবনেও দেখেছি ঠাকুরের কাছে হয়ত দু এক ঘণ্টা মাত্র কাটিয়ে এলাম—সব দিন তেমন বেশী কথাবার্তাও হত না: কিন্তু তার ফল বহু দিন পর্যন্ত থাকত। কেমন যেন একটা নেশার মত হয়ে যেত; সর্বক্ষণই ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে থাক্‌তাম। তাঁর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবান—যুগাবতার। তাঁর কৃপাকটাক্ষে সমাধি হয়ে যেত—, তিনি স্পর্শ মাত্রে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন।"

"সিদ্ধ পুরুষদের সংস্পর্শে এলেও মানুষের মনে ভগবদ্‌ভাবের স্ফুরণ হবেই হবে। ঐ তো হল মজা! কেউ বাস্তবিক ভগবান লাভ করেছে কি না তার পরীক্ষাও হল এই। ভগবদ্‌দ্রষ্টা পুরুষের কাছে গেলেই প্রাণে ঈশ্বরীয় ভাব জেগে ওঠে। বৈষ্ণব গ্রন্থে একটি অতি সুন্দর কথা আছে—'যাহারে দেখিলে প্রাণে উঠে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান।' যেমন আগুনের পাশে গেলে গায়ে তাপ অনুভব হয় তেমনি যথার্থ সাধুপুরুষদের কাছে গেলে মনপ্রাণ ভগবদ্‌ভাবে মেতে উঠবে।"

"'কুসুমের সহ কীট সুর শিরে যায়। সেইরূপ সাধুসঙ্গ অধমে তরায়।' সংসারতাপে দগ্ধ হলে বা দুঃখ কষ্টে পড়লেই যে সাধু-সঙ্গের প্রয়োজন, তা নয়। যারা সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত, ভোগ-বিলাসে মত্ত, তারাও যদি সুকৃতিফলে সাধুসঙ্গ লাভ করে, তাহলে তাদেরও মন থেকে তথাকথিত অনিত্য সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে চলে যায়, নিত্য সুখের দিকে মন ধাবিত হয় এবং সব চাইতে সেরা আনন্দ সেই পরমানন্দের আস্বাদ পেয়ে জীবন ধন্য হয়ে যায়। ঠাকুরের কাছেও কত ধনী বড় লোক এসেছিল। তিনি দয়া করে তাদের মনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তারা ভগবদানন্দে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। আমরাও যদি ঠাকুরের দর্শন না পেতাম, তাঁর কৃপা লাভ না হত তা হলে কি এমনটি হতে পারতাম? তাঁর কৃপার কথা আর কি বলব? * * * ঠাকুর তো আর কেউ নন, সেই মা কালীই তাঁর রূপে প্রকাশিত হয়ে জগৎ উদ্ধার করছেন। আহা কী দয়া—কত দয়া! আমাদের মহা ভাগ্য যে, এমন অবতার পুরুষের সঙ্গলাভ করেছি। আমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে। তোমাদেরও বলছি—তিনি যুগাবতার; জীবের রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা—ভগবান। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক—সব হয়ে যাবে। ভক্তি, মুক্তি, সব পাবে। আমার এই এক কথা।"

বেলুড় মঠ

বুধবার, ২৭শে জুলাই, ১৯৩২

বিকেল বেলা মহাপুরুষজীর ঘর ঝাড়া হচ্ছিল। সে জন্ম মহাপুরুষ মহারাজ পাশের ঘরে গঙ্গার দিকে মুখ করে বসেছেন এবং জনৈক ব্রহ্মচারীকে "কালীনামের গণ্ডী দিয়ে আছি রে দাঁড়িয়ে" এই গানটি নিজে গেয়ে গেয়ে শেখাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে শ্লেষ্মায় গলা বন্ধ হয়ে আসছিল এবং গলা ঝেড়ে গাইতে গাইতে বললেন—"গলা নেই ; এখন কি আর গাইব ?" অথচ কি মধুর কণ্ঠ !

পরে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করল—"কে কানাই নাম ঘুচালে তোর" এই গানটি ঠাকুর গাইতেন কি ?

মহাপুরুষজী—"হাঁ, ঠাকুর এ গানটি গাইতেন", এই বলে নিজেই গাইতে লাগলেন।—

"কে কানাই নাম ঘুচালে তোর, ব্রজের মাখনচোর।
কোথারে তোর পীতধড়া, কে নিল তোর মোহন চূড়া
নদে এসে নেড়ামুড়া, পরেছ কৌপীন ডোর॥
এ কি ভাব রে কানাই, কি অভাবে রে কানাই
ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করে তুমি পরেছ কৌপীন ডোর।
অশ্রু কম্প ষড়ভঙ্গ, পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ।
সঙ্গে লয়ে সাঙ্গ পাঙ্গ, হরিনামে হয়ে বিভোর॥"

গানটি গাওয়া হলে একটু চুপ করে থেকে বল্লেন—"আহা! ঠাকুর কী গানই গাইতেন! আর গান গাইতে গাইতেই ভাবস্থ হয়ে পড়তেন। অমন মধুর আর প্রাণমাতান গান আর কারও শুনি

নি। তাঁর গানে মনপ্রাণ ভরে রয়েছে। আর কী মনোহর নৃত্য! ভাবে তন্ময় হয়ে নাচতেন কি না! তাই অত সুন্দর দেখাত। তাঁর দেহটি অতি সুঠাম ও খুবই কোমল ছিল। ভাবের আনন্দে ভরপুর হয়ে তিনি নৃত্য করতেন। সে সব দৃশ্য এখনও যেন চোখের ওপর ভাসছে। তাঁর ঐ মনোহর নৃত্য দেখে আমাদেরও ভেতর হতে নাচতে ইচ্ছা হত। তিনিও আমাদের টেনে নিয়ে ধরে ধরে নাচাতেন। কখনও বলতেন—'লজ্জা কি রে? হরিনামে নৃত্য করবি, তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—এ তিন থাকতে নয়। যে হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে না পারে তার জন্মই বৃথা'—এই সব বলতেন। বরাহনগর মঠে আমরা সেই ভাঙ্গা বাড়ীটাতে এত নাচতুম যে, ভয় হত বাড়ী ভেঙ্গে পড়ে গেল বুঝি। আহা, ধন্য মহাপ্রভু! জীবের কল্যাণের জন্য তিনি কি না করে গেলেন! এই উচ্চ নামসংকীর্তন, হরিনামের ধ্বনি, যত দূর পৌঁছে তত দূর সব পবিত্র হয়ে যায়। গিরিশ বাবু এ গানটি চমৎকার বেঁধেছেন—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার! কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ-কাননচারী ইত্যাদি।"

খানিক পরে মহাপুরুষজী ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকের বারান্দায় গেলেন। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দৃশ্য দেখলেন। জনৈক শিষ্য এখনও ভগবান লাভ হল না বলে মানসিক মহা অশান্তি জানাতে তিনি বল্লেন—"ঠাকুরের নিকট কাঁদ; তাঁকে ডাক; ধীরে ধীরে হবে। বাবা! মনে কি অমনি শান্তি আসে? খুব ডাক, খুব কাঁদ।" গঙ্গায় একখানি নৌকা পালভরে যাচ্ছিল। তা দেখিয়ে শিষ্যকে বল্লেন—"দক্ষিণে বাতাসে নৌকাখানি কেমন

পাল তুলে যাচ্ছে—এই দেখ। বুঝলে? গুরুকৃপা সাধনভজনের অনুকূল। মায়ের ইচ্ছায় তোমার তা হয়েছে। এখন খুব ভজন-সাধন লাগাও। রাত্রে কম খাবে, আর খুব জপধ্যান করবে। ধ্যান-জপের প্রকৃষ্ট সময়ই হল রাত্রি। গঙ্গাতীর, গুরুস্থান, আর এমন সব সাধুসঙ্গ—খুব শীঘ্র হবে। মাঝে মাঝে রাত্রের খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়ে সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত জপ কর। সব মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ডাক। কাজকর্ম করবে কিন্তু মন সর্বদা হরিপাদপদ্মে লিপ্ত রাখবে। পরে গুনগুন করে গাইলেন—'পীলে রে অব্‌ধুত, হো মাতোয়ারা, পেয়ালা প্রেম হরিরস কা রে' ইত্যাদি।"

বেলুড় মঠ

১৯৩২

এ সময় মহাপুরুষ মহারাজের ঘুম বড় একটা হত না। সর্বক্ষণই কোন না কোন দিব্যভাবের প্রেরণায় বিমলানন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। দিনের বেলায় মঠের সাধুব্রহ্মচারী ও অগণিত ভক্তদের সঙ্গে নানাবিধ প্রসঙ্গের ভেতর দিয়ে তাঁর মনের সেই আনন্দ-ভাবের কথঞ্চিৎ আভাস ফুটে বেরুত। কখনও কখনও এত উচ্চাবস্থার কথা বলতেন যে, অনেকেই তার মর্ম গ্রহণে সক্ষম হত না। রাত্রি বেলাই বিশেষ করে তাঁর খুব ভাবান্তর লক্ষিত হত। কখনও আত্মারাম হয়ে মনের আনন্দে বিভোর হয়ে গুনগুন করে গান গাইতেন। কখনও বা উপনিষৎ, গীতা, চণ্ডী বা ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোক আবৃত্তি করতেন। আবার আবৃত্তি করতে করতে

ক্ষণে ক্ষণে চুপ হয়ে যেতেন। অনেক সময়েই তাঁর বাহিক জগৎ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার জ্ঞান রহিত হয়ে যেত।

একদিন তিনি তাঁর তক্তাপোষের উপর চুপ করে বসে আছেন; চক্ষু মুদ্রিত। রাত প্রায় দুটো। সমগ্র মঠ নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ এই ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকার পরে ধীরে ধীরে আপন মনেই আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

পরে নিকটস্থ সেবককে লক্ষ্য করে বল্লেন—"এর অর্থ কি জানিস্?" সেবক মৌন হয়ে থাকায় তিনি নিজেই বলতে লাগলেন—"যেমন নানা নদনদী দ্বারা সদা পরিপূর্ণস্বভাব ও অচলভাবে অবস্থিত সমুদ্রের মধ্যে জলরাশি প্রবেশ করে, অথচ সমুদ্র তাতে মোটেই উদ্বেলিত হয় না, তেমনি সমুদ্রবৎ সদা পরিপূর্ণ ও ব্রহ্মানন্দে স্থিত জ্ঞানীর হৃদয়ে প্রারব্ধবশতঃ কামনাসকল প্রবেশ করে সত্য, কিন্তু তাতে তাঁর মন আদৌ বিচলিত হয় না—তিনি কৈবল্যরূপ শান্তিলাভে আত্মারাম হয়ে অবস্থিত থাকেন। কিন্তু ভোগকামনাশীল ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে নিঃস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমত্ব-বুদ্ধিশূন্য হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।"

"কামনা-বাসনা থাকলে চির শান্তিলাভ করা অসম্ভব; আর সেই কামনা-বাসনা ভগবৎকৃপা ছাড়া সমূলে বিনষ্ট হওয়াও সম্ভবপর নয়।

ঠাকুর কৃপা করে আমার সব কামনা-বাসনা একেবারে মুছে দিয়েছেন ; কোন বাসনা নেই। এই শরীরটা কেবল তাঁর ইচ্ছায়, তাঁরই কাজের জন্য রয়েছে ; আমি তো শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। এ শরীরটাও যে আছে তাই অনেক সময় মনে হয় না। তবে প্রভুর অনেক কাজ এই শরীর দিয়ে করাচ্ছেন, তাই তিনি এই শরীর এখনও রেখেছেন। আমার কিন্তু কোনও বাসনা নেই, বুঝলি? আমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ। এই বলে ধীর স্থির হয়ে বসে রইলেন। তখন তাঁর চেহারা একেবারে বদলে গেছে ; তিনি যেন এক নূতন লোক। তাঁর দিকে তাকাতে ভয় হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে আপন মনেই বলতে লাগলেন—"মা, আমায় কৃপা করে সব দিয়েছেন। তাঁর ভাণ্ডার খালি করে আমায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আমার আর কিছু চাইবার নেই। তাঁর কৃপায় সব লাভ হয়েছে—'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' তবু যে তিনি এ শরীরটা কেন রেখেছেন তিনিই জানেন।"

গভীর রাত। মহাপুরুষজী তাঁর খাটে বসে আছেন—ধ্যানস্থ। অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পরে আপন ভাবে এক একবার চোখ মেলে দেখে আবার চোখ বুজে বসে আছেন। এমন সময় হঠাৎ একটা বেরাল ঘরের মেঝের উপর মিউমিউ করে ডেকে উঠল। তিনি সেদিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বেরালের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। তিনি যে বেরালকে প্রণাম করছিলেন নিকটস্থ সেবক প্রথমটায় তা বুঝতেই পারে নি। সেজন্য সে একটু সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বল্লেন—"দেখ্, ঠাকুর আমায় এখন এমন অবস্থায় রেখেছেন যে, সবই দেখছি 'চিন্ময়' ; ঘর-দোর, খাট-বিছানা এবং সব প্রাণীর ভেতরই সেই এক চৈতন্যের খেলা—কেবল নামের

ভেদ মাত্র ; কিন্তু মূলে সব একই। বেশ পরিষ্কার দেখছি! অনেক চেষ্টা করেও সে ভাবটা সামলাতে পাচ্ছি নে। সবই চৈতন্যময়। এই বেরালের ভেতরও সেই চৈতন্যের প্রকাশ জ্বল জ্বল করছে।· এই ভাবেই ঠাকুর আজকাল আমায় ভরপূর করে রেখেছেন। লোকজন আসে যায় ; কথাবার্তা বলতে হয় বলি ; সাধারণ কাজকর্ম বা আহারাদি করতে হয় করি। যেন অভ্যাস বশতঃ করে যাই। কিন্তু এসব থেকে মন একটু তুলে নিলেই দেখি যে, সর্বত্রই সেই চৈতন্যের খেলা। নামরূপ এ সব তো অতি নিম্ন স্তরের ব্যাপার। নামরূপের ওপরে মন গেলেই বাস! তখন সবই চৈতন্যময়, আনন্দময়। এসব বলে বোঝাবার জিনিস নয়। যার সে অবস্থা হয় সেই জানে।" আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলেন ; কিন্তু ঐটুকু বলেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। সেবক মুগ্ধ প্রাণে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। * * *

শুধু গুরুসেবা করলেই সব হবে না, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র সাধন-ভজনেরও বিশেষ প্রয়োজন—সে বিষয়ে মহাপুরুষ মহারাজ সেবকদের খুবই বলতেন। ভজনসাধন না করে খালি মহাপুরুষদের সঙ্গ বা সেবা করলে অনেক সময় মনে অহঙ্কার অভিমান এসে পড়ার খুবই সম্ভাবনা—সে বিষয়েও সেবকদের বিশেষ সতর্ক করে দিতেন। একদিন গভীর রাত্রে জনৈক সেবককে বল্লেন,—"দেখ্, আমার সেবা করছিস্ এ খুবই ভাল। ঠাকুরের মহা কৃপা তোর উপর যে, তাঁর একজন সন্তানের সেবা তিনি তোর দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু বাবা, সঙ্গে সঙ্গে সাধনভজনও করা চাই। নিয়মিত জপধ্যান, ভজনসাধন করলে তবেই ঠাকুর যে কি ছিলেন তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে। আমাদের ওপর মানুষবুদ্ধি এলেই মারা যাবি—বেশ মনে

রাখবি। ভগবদ্‌বুদ্ধি আনার জন্ম চাই তীব্র সাধনা। ভগবানের নাম, তাঁর ধ্যান করতে করতে মন সংস্কৃত হলে সেই শুদ্ধ মনে ভগবদ্ভাব উদ্দীপিত হয়। আমরা তো ঠাকুরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গ করেছি, তাঁর কৃপা পেয়েছি; তবু তিনি আমাদের কত উগ্র সাধনা করিয়ে নিয়েছেন। তিনি যে ভগবান, তিনি যে এসেছিলেন জগৎকে মুক্তি দেবার জন্ম, তা কি আমরাই প্রথমটা ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলাম? ক্রমে সাধনভজনের দ্বারা সে জ্ঞান পাকা হয়ে গেছে। অবশ্য তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হয় নি। তবে কাতর হয়ে ডাকলে, ব্যাকুল হয়ে চাইলে, তিনি কৃপা করেনও। তিনি যে ভগবান, সাক্ষাৎ দেবাদিদেব জগন্নাথ, তা ক্রমে বুঝতে পেরেছি। তাঁর ঠিক ঠিক স্বরূপ কি তিনি কৃপা করে জানিয়ে দিয়েছেন।

"জপ করবি গভীর রাতে। মহানিশায় জপ করলে খুব শীঘ্র শীঘ্র ফল পাবি। সমগ্র মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যাবে। এত আনন্দ পাবি যে, জপ ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছা হবে না। এই তো আমার সেবার জন্ম জেগে থাকতে হয়। এ সময় বসে বসে জপ করবি। এখানে তো আর সব সময় কাজ থাকে না। কখনও দৈবাৎ কোন কাজের দরকার হয়। এ তো বেশ সুবিধা। খুব জপ করবি —বুঝলি? সময় বৃথা যেতে দিস্ নি বাবা। তাঁর নামে একেবারে ডুবে যেতে হবে, ভাসা ভাসা হলে কিছুই হবে না। যতটুকু করবি তন্ময় হয়ে করবি; তবেই আনন্দ পাবি। তাই তো ঠাকুর গাইতেন— 'ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।' যে কোন কাজে ডুবে যেতে না পারলে আনন্দ নেই। তিনি দেখেন প্রাণ, আন্তরিকতা; তিনি সময় দেখেন না। আর ধ্যানজপ নিত্য

নিয়মিতভাবে করলে তাতে মন শুদ্ধ হয় এবং সে ভাব হৃদয়ে পাকা হয়ে যায়। নিত্য নিরন্তর অভ্যাস করা চাই। গীতাতে ভগবান বলেছেন—'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে নিত্য ডেকে যা; দেখবি যে সেই ব্রহ্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠবেন, ব্রহ্মানন্দের রাস্তা খুলে দেবেন। সেই ব্রহ্মময়ী মা প্রসন্না হলেই সব হল। চণ্ডীতে আছে—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' সেই তিনিই প্রসন্না হয়ে মানবগণের মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন। তিনি দু হাত বাড়িয়ে আছেন দেবার জন্য; কিন্তু নিচ্ছে কে? তাঁর কাছে একটু কাতর প্রাণে চাইলেই তিনি সব দিয়ে দেন—ভক্তি, মুক্তি সব।

"বাড়ি-ঘর ছেড়ে এসেছিস্ ভগবান লাভ করবি বলে। ঐ তো জীবনের উদ্দেশ্য। আসলে যেন ভুল না হয়ে যায়। খুব খেটে নিরন্তর জপধ্যান স্মরণ-মনন করে ঠাকুরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নে; তখন খালি আনন্দম্—খুব মজায় থাকবি। সব দেহেরই নাশ আছে। আমাদের শরীরই বা আর ক দিন? এই তো বৃদ্ধ শরীর! এখন চলে গেলেই হল—তখন সব অন্ধকার দেখবি। কিন্তু জপধ্যান করে যদি ইষ্ট দর্শন করে নিতে পারিস্ তো তখন দেখবি যে, গুরু ইষ্ট একই এবং গুরু তোর হৃদয়-মন্দিরেই চির-প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। স্থূল দেহনাশে গুরুর নাশ হয় না। তোদের ভালবাসি বলেই এত বলছি। তোদের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাই তো আমার একমাত্র প্রার্থনা।

* * * *

"তোরা আমার কাছে আছিস্, আমার শরীর অসুস্থ বলে দিনরাত সেবা করছিস্। তা বেশ! কিন্তু একমাত্র তোরাই

যে আমার সেবা করছিস্ আর খুব বড় কাজ করছিস্ অমন যদি ভাবিস্ তো তোদের মস্ত ভুল, বুঝলি? এই একটা কিছু এগিয়ে দিয়ে, একটু দেহের সেবা করে বুঝি আমার খুব সেবা করা হল? তা নয়। অনেক দূরে থেকেও মনপ্রাণ দিয়ে প্রভুর কাজ করলেই আমাদের সেবা করা হয়। ঠাকুরই হলেন আমার অন্তরাত্মা। যারা হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও কায়মনোবাক্যে প্রভুর কাজ করছে, সাধনভজন দ্বারা প্রভুকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারা আমার খুবই প্রিয়, তারা আমারই সেবা করছে। তাঁকে সেবা দ্বারা তুষ্ট করলেই আমি তুষ্ট। 'তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টম্।' প্রভুর কাজ করে গুরুসেবাফলের চাইতে তারা আরও বেশী ফল পাবে।"

বেলুড় মঠ

১৯৩২

সকাল বেলা মঠের সাধুব্রহ্মচারীদের মধ্যে অনেকেই মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে চলে গেছেন। জনৈক সন্ন্যাসী প্রণামান্তর নিজের প্রাণের মহা অশান্তি ও নৈরাশ্যের কথা অতি কাতরভাবে নিবেদন করাতে মহাপুরুষজী বল্লেন—"ভয় কি বাবা, শরণাগত হয়ে পড়ে থাক তাঁর দুয়ারে, তিনি কাউকে বিমুখ করেন না।"

সন্ন্যাসী—"এতদিন বৃথায় কেটে গেল; এখনও ভগবান লাভ হল না, শান্তি লাভ হল না। এক এক সময় দারুণ অবিশ্বাস মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এত কাল আপনাদের যে সব উপদেশবাক্য শুনেছি সে সবেও সন্দেহ এসে যায়।"

এই শুনে মহাপুরুষ মহারাজের সারা মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠল। তিনি একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লেন—"দেখ বাবা, ঠাকুর যদি সত্য হন তো আমরাও সত্য। যা বলছি, ঠিক ঠিক বলছি; আমরা লোক ঠকাতে আসি নি। যদি আমরা ডুবি তো তোমরাও ডুববে; কিন্তু তাঁর কৃপায় জেনেছি যে, আমরা ডুবব না আর তোমরাও ডুববে না।"

*　　*　　*　　*

মহাপুরুষ মহারাজ বেশী চলাফেরা করতে পারেন না। সেজন্য একজন সেবকের উপর ভার পড়েছিল যে, রোজ বিকেলে ঘণ্টা দেড়েক সারা মঠ ঘুরে অসুস্থ সাধুব্রহ্মচারীদের, গরুবাছুর-গুলির এবং মঠের অন্যান্য বিষয়ের যাবতীয় খবর নিয়ে সব তাঁকে বিস্তারিত ভাবে জানাবে। একদিন যথারীতি সারা মঠ ঘুরে সব খবরাদি নিয়ে সেবক উপরে গিয়ে দেখে যে, মহাপুরুষজী একা খুব গম্ভীরভাবে বসে আছেন। চক্ষু অর্ধ নিমীলিত, যেন জোর করে বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন। সেবক সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও অন্যদিনের ন্যায় কোন প্রশ্নই তিনি করলেন না। মনে হল যেন সেবকের উপস্থিতি তিনি আদৌ জানতে পারেন নি। তাঁর এই প্রকার ভাবান্তর দেখে সেবক স্তম্ভিত হয়ে একপাশে সরে গেল। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হবার পরে যখন তিনি এদিক সেদিক একটু তাকাতে লাগলেন তখন সেবক সামনে গিয়ে অন্য দিনের মত সব খবর বলতে আরম্ভ করামাত্রই মহাপুরুষজী ধীরভাবে বল্লেন—"দেখ, আমার কাছে এ জগৎটার কোন অস্তিত্বই নেই; একমাত্র ব্রহ্মই রয়েছেন। নেহাৎ মনটা নীচে নামিয়ে

রাখবার জন্য কথাবার্তাও বলি এবং পাঁচ রকম খবরাখবরও নিই।" এইমাত্র বলে পুনরায় গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। সেদিন আর কোন খবরই শুনলেন না।

* * * *

বরাহনগর মঠে অবস্থানকালীন স্বামিজীর সম্বন্ধে তাঁর একটি দর্শনের কথা একদিন বলেছিলেন—"দেখ, বরাহনগর মঠে স্বামিজীর সঙ্গে থাকতে এক আশ্চর্য ঘটনা হয়েছিল। তখন আমরা ওপরের হল ঘরে সকলে এক সঙ্গেই শুতাম। বিছানাপত্র তো তেমন কিছু ছিল না। প্রকাণ্ড একটি মশারি ছিল; তাই খাটিয়ে সকলে একই মশারির নীচে শোওয়া যেত। এক রাত্রিতে স্বামিজীর পাশে শুয়ে আছি। সে মশারির নীচে শশী মহারাজ প্রভৃতি আরও কে কে ছিলেন। গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি মশারির ভেতরটা একেবারে আলোকিত হয়ে গেছে। স্বামিজী তো আমার পাশেই শুয়েছিলেন; কিন্তু দেখি যে, স্বামিজী সেখানে নেই। তার পরিবর্তে সেখানে ছোট ছোট সাত আট বছরের ছেলের মত উলঙ্গ, সুন্দর, জটাজুটধারী, শ্বেতবর্ণ অনেকগুলি শিব শুয়ে আছেন। তাঁদেরই অঙ্গচ্ছটাতে সব আলোকিত হয়ে গেছে। আমি তো তাই দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। প্রথমটায় ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে হল, এ চোখের ভ্রম। ভাল করে চোখ রগড়ে আবার দেখলাম; ঠিক তেমনিভাবে ছোট ছোট শিবগুলি দিব্যি শুয়ে আছেন। তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। শুতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। ভয়ও হচ্ছিল যে, পাছে ঘুমের ঘোরে আমার পা শিবদের গায়ে লেগে যায়। সে

রাতটা ধ্যান করেই কাটিয়ে দিলাম। ভোর হতে দেখি যে, স্বামিজী যেমন ঘুমুচ্ছিলেন তেমনই ঘুমুচ্ছেন। সকালে স্বামিজীকে সব বল্লাম। তিনি শুনে খুব হাসতে লাগলেন।

"অনেক দিন পরে হঠাৎ ৺বীরেশ্বর শিবের স্তোত্র * পড়ে দেখি যে, তাঁর ধ্যানে ঠিক ঐরূপ বর্ণনা রয়েছে। তখন বুঝলাম যে, আমি ঠিকই দেখেছিলাম। স্বামিজীর স্বরূপই তাই। ঐ শিবের অংশেই তাঁর জন্ম কি না—তাই ঐ রকম দর্শন হয়ে গেল।"

* * * *

মহাপুরুষ মহারাজের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছিল। চলাফেরা প্রায় এক প্রকার বন্ধ। নীচে নেমে বেড়ান তো দূরের কথা উপরেও অন্যের সাহায্য ব্যতীত বড় একটা হাঁটতে পারেন না। সেই সময় তিনি একদিন বলেছিলেন—"বাইরের প্রচেষ্টা যত কমে যাচ্ছে ভেতরের প্রচেষ্টা ততই বেড়ে চলেছে। সেই পরমানন্দের খনি তো ভেতরেই। এখন এই ভাবেই চলবে, এই ঠাকুরের ইচ্ছা।" আর প্রায়ই মধুর স্বরে এই গানটি গাইতেন—"শমন আসার পথ ঘুচেছে;

* বীরেশ্বর স্তোত্রম্ (আংশিক)

বিভূতিভূষিতং বালমষ্টবর্ষাকৃতিং শিশুম্।
আকর্ণপূর্ণনেত্রঞ্চ সুবক্ত্রু দশনচ্ছদম্॥
চারুপিঙ্গজটামৌলিং নগ্নং প্রহসিতাননম্।
শৈশবোচিত-নেপথ্যধারিণং চিত্তহারিণম্॥ ইত্যাদি।

(বিভূতিভূষিত অষ্টমবর্ষ বয়স্ক বালক; তাহার নয়ন আকর্ণ বিস্তৃত এবং বদন ও দন্তপাটী সুন্দর, মস্তকে সুন্দর পিঙ্গল বর্ণের জটা; সে নগ্ন ও সহাস্য বদন এবং তাহার অঙ্গে শৈশবোচিত মনোহর অলঙ্কার।)

(আমার) মনের সন্দ দূরে গেছে" ইত্যাদি। নিজের দর্শনাদির কথাও মাঝে মাঝে কিছু বলতেন। একদিন সন্ধ্যা বেলা, তখনও ঠাকুরের আরাত্রিক আরম্ভ হয় নি, সবে মাত্র সব ঘরে আলো জ্বালা হয়েছে। মহাপুরুষ মহারাজ চুপচাপ বসেছিলেন ঠাকুরের দিকে মুখ করে। হঠাৎ বল্লেন—"দে দে, আমায় বিশ্বনাথের বিভূতি দে, আর বিছানার ওপর একখানি গরদের চাদর তাড়াতাড়ি পেতে দে। আহা, এই যে ঠাকুর এসেছেন, মহাদেব এসেছেন।" এই বলতে বলতে হঠাৎ ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত এইভাবে ধ্যানস্থ ছিলেন।

আর একদিন বিকেল বেলা বল্লেন—"এইমাত্র স্বামিজী ও মহারাজ এসেছিলেন, আর বল্লেন—'চল তারক দা!' তোরা দেখতে পেলি নি? এই যে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।"

* * * *

আত্মজ্ঞ পুরুষদের ছোট-খাট কাজকর্ম ও কথাবার্তার ভেতরও একটা গূঢ় রহস্য নিহিত থাকে। সাধারণ মানব নিজেদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির মাপকাঠি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের কার্যাবলী বিচার করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে অনেক সময়ই সে সিদ্ধান্ত নির্ভুল হয় না। অনুমান ১৯১২ সালের কঠিন রক্তামাশয় রোগের পর থেকেই মহাপুরুষ মহারাজ আহারাদিতে খুবই বেশী ধরা-কাট করে চলতেন। তাঁর দুপুরের আহার ছিল খুব সাধারণ ঝোল ভাত ও সামান্য ভাতে ভাত। পূজনীয় শরৎ মহারাজ সেই ঝোলকে ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলেন 'মহাপুরুষের ঝোল'। রাত্রের আহারও তেমনি অল্প ও সাদাসিদে। কিন্তু সন ১৯৩৩

সালে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাক্‌শক্তি একেবারে রোধ হয়ে যাবার প্রায় এক বৎসর কাল পূর্ব হতে সেই মহাপুরুষ মহারাজই সেবকদের কখন কোন ভাল জিনিস রান্নার ফরমাস করতেন বা কোন বিশেষ জিনিস খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। তাঁর এই প্রকার ভাবান্তর মঠের সমগ্র সাধুমণ্ডলী ও সেবকদের মনে একটি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল; বিশেষ সে সময় তাঁর শরীর খুবই খারাপ এবং ডাক্তারেরাও তাঁকে অনেক সময় কেবলমাত্র জলীয় পদার্থ খেয়েই থাকতে বলতেন।

একদিন সকাল বেলা তিনি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ বল্লেন—"দেখ, ঠাকুরের কথায় পাঁকাল মাছের কথা আছে। তিনি বলেছেন—'পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু তার গায়ে পাঁকের দাগটি পর্যন্ত লাগে না। তেমনি কেউ যদি ভগবান লাভ করে সংসারে থাকে তো তার মনে আর সংসারের ছাপ পড়ে না।' আচ্ছা, এই পাঁকাল মাছ কি রকম একবার দেখতে হবে। আর খেয়েও দেখতে হবে পাঁকাল মাছ কেমন।" অনেক চেষ্টা করে বরাহনগরের এক মেছুনীর সাহায্যে তিন চারটি পাঁকাল মাছ যোগাড় করা হল। তিনি ঐ পাঁকাল মাছ দেখে ভারি খুসী! বালকের মত আনন্দ করতে লাগলেন। পরে ঐ পাঁকাল মাছ তাঁর জন্য রান্না করে দেওয়া হল। তিনি সামান্য একটু খুঁটে নিয়ে মুখে দিয়ে দু একবার মুখে নাড়াচাড়া করে ফেলে দিয়ে বল্লেন—"এই হয়ে গেল পাঁকাল মাছ খাওয়া। ইচ্ছে হয়েছিল, তাই একটু খেয়ে দেখলাম। ঠাকুর বলতেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাগুলি মিটিয়ে নিতে হয়।" তার পর হাসতে হাসতে

বল্লেন—"তা কে জানে বাপু? যদি এতটুকু বাসনার জন্তই আবার জন্ম নিতে হয়?"

তাঁর সন্ন্যাসরোগ হবার মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তাঁর পাকা আম খাবার ইচ্ছে হয়। তখনও বাজারে ভাল আম ওঠে নি। কলকাতার সব বাজারে সন্ধান করে গুটিকতক আম তাঁর জন্ম আনা হল। তিনি সবগুলি ঠাকুরের ভোগের জন্ম দিয়ে নিজের জন্ম একটি মাত্র আম রাখলেন এবং খাবার সময় ঐ আমটির রস করে তাঁকে দেবার জন্ম সেবককে আদেশ করলেন। তখন তিনি হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন; তার ওপর আমের রস খেলে যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হবে তা ভেবেই সেবকগণ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। অগত্যা প্রধান সেবক তাঁকে ডাক্তারদের নাম করে আমের রস না খাবার জন্ম অনুরোধ করলেন। কিন্তু বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি খুবই গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—"আমি বলছি খাব।" আহারাদি শেষ হবার সময় যখন আমের রস তাঁর সামনে দেওয়া হল, তিনি সেই আমের রসে আঙ্গুল ডুবিয়ে একটু মুখে দিয়ে বল্লেন—"আমার আমের রস খাওয়া হয়ে গেল। ইচ্ছে হয়েছিল, তাই একটু মুখে দিলুম। * * * আমি কি লোভ করে খাই? আমি যে কেন এটা ওটা একটু একটু চেয়ে খাই তার অর্থ অন্যে কি বুঝবে?" পরে একটু যেন উত্তেজিত হয়ে বল্লেন—"খাবার জন্য আমায় বলতে এসেছে! জান ইচ্ছামাত্র এক্ষুণি এ শরীর পর্যন্ত ছেড়ে দিতে পারি? তা তুচ্ছ খাবার! স্বামিজী কেন 'মহাপুরুষ' নাম রেখেছিলেন?" * * * ইত্যাদি অনেক কথা সেদিন বলেছিলেন।

সারা দিনই তিনি খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁর মন অন্য রাজ্যে বিচরণ করছে।

* * * *

জনৈকা স্ত্রী-ভক্তের একমাত্র সন্তান কঠিন রোগাক্রান্ত হয়। চিকিৎসাদিতে রোগের উপশম না হয়ে যখন ডাক্তারদের মতে রোগীর বাঁচবার কোনই আশা ছিল না, তখন সেই স্ত্রীভক্তটি অনন্যোপায় হয়ে মহাপুরুষজীর চরণপ্রান্তে উপনীত হয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন—"বাবা, আপনি একবার বলুন যে, আমার ছেলেটি সেরে উঠবে।" মহাপুরুষজী ধীরভাবে সব শুনলেন। স্ত্রী-ভক্তটির বারংবার কাতর প্রার্থনার পরে তিনি বল্লেন—"ঠাকুরের ইচ্ছে হয় তো সেরে যাবে।" কিন্তু ছেলেটি কয়েক দিন পরেই মারা গেল। তখন একমাত্র সন্তানহারা হয়ে স্ত্রী-ভক্তটি তাঁর নিকট খুবই বিলাপ করে কেঁদে কেঁদে অনুযোগ করে বললে—"আপনি তো বলেছিলেন—ছেলে ভাল হয়ে যাবে, তবে যে মারা গেল? আমি এখন কি নিয়ে থাকব?" স্ত্রী-ভক্তটী বারবারই তাঁকে এই বলে অনুযোগ করে কাঁদতে লাগল। সে যে কী কান্না! তখন মহাপুরুষজী বল্লেন—"দেখ মা, আমি জানতুম যে, ছেলে বাঁচবে না; কিন্তু তুমি যে ছেলের মা। মার কাছে কি করে বলি যে, তার ছেলে মারা যাবে? তাই বাধ্য হয়ে বলেছিলাম যে, ঠাকুরের ইচ্ছে হয় তো ভাল হয়ে যাবে। তুমি কেঁদো না মা। আমি বলছি, ঠাকুর কৃপা করে তোমার প্রাণের সব শোক তাপ মুছে দেবেন। তুমি এখন হতে ঠাকুরকেই তোমার ছেলে বলে ভাববে। তিনি দয়া করে তোমার সব অভাব পূর্ণ করে

দেবেন, তোমার প্রাণে অপার্থিব শান্তি দেবেন।” তাঁর আশ্বাসবাণী ও আশীর্বাদ পেয়ে স্ত্রী-ভক্তটির প্রাণ শান্ত হয়ে গেল এবং পরে তার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছিল।

*   *   *   *

একদিন বেলুড় মঠে ক্ব— মহারাজ মহাপুরুষজীর নিকট জনৈক ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করছিলেন। তিনি সব শুনে বল্লেন—“দেখ ক্ব—, ঠাকুর বলতেন বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে হয়। তিনি যে শুধু এ কথা মুখেই বলতেন তা নয়, তাঁর দৃষ্টিই ছিল সেই রকম। তা না হলে আমরাই কি তাঁর আশ্রয়ে থাকতে পারতাম? দোষ না দেখে তিনি কৃপা করে আমাদের টেনে নিয়েছিলেন বলেই তো আমরা তাঁর আশ্রয় পেয়েছিলাম। একেবারে দোষ না আছে কার? এখানে সকলে পূর্ণ নির্দোষ হতে এসেছে, কিন্তু নির্দোষ হয়ে তো কেউ আসে নি? অমন একটু আধটু দোষ ক্রমে ঠাকুরের কৃপায় সব শুধরে যাবে। কোন রকমে তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাকতে পারলেই তিনি কৃপা করে ক্রমে ঠিক করে নেবেন।” মহাপুরুষজীর এ সব কথা শুনেও ক্ব— মহারাজ পুনরায় বল্লেন—“আপনি ডেকে তাকে একটু ধমকে দিলে ঠিক হয়। তার সম্বন্ধে আপনি ইতিপূর্বে যা শুনেছিলেন, ওসব বোধ হয় ঠিক নয়। আমি খুব ভাল রকমে জেনেই আপনাকে বলছি।” তখন মহাপুরুষজী হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে একটু দৃঢ়স্বরে বল্লেন—“দেখ ক্ব—, তুমি কি আমার চাইতেও বেশী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন? ঠাকুরের কৃপায় আমরা এক নজরে সব বুঝতে পারি, লোকের ভিতর বার সব দেখতে পাই। ঠাকুর অনেক ভাবে

আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে সব তোমায় কি বলব? কাউকেই বলবার নয়। কে কেমন লোক, কবে হবে না হবে, সে সব আমরা খুব জানি। খালি বললে বা ধমকালে মানুষের দোষ শোধরায় না। পার তো নিজ আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা লোকের মনের গতি ফিরিয়ে দাও।" মহাপুরুষজীর গাম্ভীর্য ও চোখমুখের চেহারা দেখে কৃ— মহারাজ একেবারে হাতজোড় করে তাঁর চরণে মাথা রেখে বল্লেন—"মহারাজ, আমি বুঝতে পারি নি। আমার অপরাধ নেবেন না, আমায় ক্ষমা করুন।" তখন তিনি বল্লেন—"যদি কাউকে শোধরাতে হয় তো তার জন্য ঠাকুরের কাছে খুব প্রার্থনা কর। ঠাকুরকে বল। তিনি যদি দয়া করেন তবেই মানুষের মনের গতি চকিতে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।" কৃ— মহারাজ চলে যাবার পরে তিনি যেন আপন মনেই বলছিলেন—"ঠাকুরের আশ্রয়ে যারা এসেছে তারা কেউ কম নয়। সব জাত সাপের বাচ্চা—নূতন ব্রহ্মচারীই হোক আর অতি প্রাচীন সাধুই হোক। কত জন্মের সুকৃতির ফলে তাঁর এই পবিত্র সঙ্ঘে আশ্রয়লাভ হয়।"

মহাপুরুষ মহারাজের কৃপা সকলের ওপরই সমভাবে বর্ষিত হত এবং সকলেরই কল্যাণ কামনায় তিনি সদা নিরত থাকতেন। অনেক সময় দেখা গেছে যে, যারা নানা হীনবৃত্তি অবলম্বন করে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র সঙ্ঘকে বিচ্ছিন্ন করতেও কুণ্ঠিত হয় নি, তাদের জন্যও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাদের নাম করে তিনি ঠাকুরের নিকট খুব কাতরভাবে প্রার্থনা করছেন। * * *

সর্বভাবময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের জীবনেও নানা

দিব্য ভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব আশ্রয় করে ভগবল্লীলা আস্বাদন করতেন। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে (১৯৩২) কোন কোন দিন সকাল বেলা দেখা যেত যে, তিনি নিজের বিছানার ওপর কথামৃত, গীতা, চণ্ডী, হিতোপদেশ, ঠাকুরমার ঝুলি, একটি খঞ্জনী, লাঠি, ছবির বই ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে বসে আছেন—যেন পাঁচ বছরের একটি বালক! আর ইচ্ছানুরূপ সব জিনিস নাড়াচাড়া করছেন। হয় তো একটু খঞ্জনী বাজালেন, ঠাকুরমার ঝুলি একটু পড়লেন আবার বা হাসতে হাসতে লাঠি হাতে সেবকদের শাসাচ্ছেন। তিনি যে কেন এরূপ করতেন তার একটু আভাস পাওয়া যায় তাঁর একদিনকার কথা থেকে। জনৈক সেবককে কথায় কথায় বলেছিলেন—"দেখ, মনটা সব সময়ই নির্গুণের দিকে ছুটে যেতে চায়; তাই এ সব পাঁচ রকম নিয়ে মনটাকে নামিয়ে রাখার চেষ্টা করি। মা যেমন খেলনা দিয়ে ছেলেদের ভুলিয়ে রাখেন তেমনি আমিও মনকে পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি।"

মহাপুরুষ মহারাজের জীবনের শেষ তিন চার বৎসর তাঁর নিকট প্রতিদিন অগণিত দীক্ষাপ্রার্থী ও ভক্তের সমাগম হত। তিনিও নিজ শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে অকাতরে সকলকে কৃপা করতেন। সে সময় দেখা যেত, তিনি রোজই বেলা ৯টা নাগাদ কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজলে হাত মুখ ধুয়ে দীক্ষা-প্রার্থীদের কৃপা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। তিনি কাউকে বিমুখ করতেন না। একদিন বহু ভক্তকে দীক্ষা দিয়ে

পরে বলেছিলেন—"বাবা, ঠাকুর বলতেন এক আধ জনকে দেখে শুনে দিতে হয়; কিন্তু এখন তো একেবারে বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। তিনি কেন যে এত লোকের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে আসছেন তা তিনিই জানেন। তাঁর ইচ্ছা; আমি আর কি করব বল? এই ভাবে এই বুড়ো শরীরটা যে আর ক দিন বইতে পারবে তা তিনিই জানেন।"

*　　*　　*　　*

বেলুড় মঠে একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক সেবককে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"দেখ, বাবা, তোদের জীবনের আদর্শ হল ঠাকুর। আর তিনি ছিলেন ত্যাগীর বাদশা। তোরা তাঁরই আশ্রয়ে এসেছিস্ তা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবি। তাঁর এই পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছিস্, সেও মহা সৌভাগ্যের কথা। তোদের ওপর কত বড় দায়িত্ব যে আছে তা ভেবে দেখবি। আমাদের শরীর আর ক দিন? এর পরে তোদের দেখেই লোকে শিখবে। ত্যাগই হল সন্ন্যাস-জীবনের ভূষণ। যে যত বেশী ত্যাগ করতে পারে সে তত ভগবানের দিকে এগোয়। খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া খুবই কঠিন, খালি বিরজা হোম করে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হল না। যে কায়মনোবাক্যে সব এষণা ত্যাগ করতে পেরেছে সেই হল ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী। যত পারিস্ ত্যাগ করে যা। দেখবি সময়ে দরকার হলে মা এত দেবেন যে সামলাতে পারবি নি। সঞ্চয় করতে নেই; এমন কি সাধুর সঞ্চয়বুদ্ধিও রাখতে নেই। ঠিক সাঁকোর জলের মত এক ধার দিয়ে আসবে আর এক দিক্ দিয়ে

বেরিয়ে যাবে; কিন্তু সঞ্চয় করেছিস্ তো আর আসবে না; তখন ময়লা জমতে শুরু করবে। আর কখনও কোন জিনিস চাইতে নেই। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাঁর আশ্রয়ে পড়ে থাক্। যখন যা দরকার মা সব দেবেন। এই দেখ্ না, এখন এত জিনিসপত্র, খাবারদাবার, কাপড়চোপড় সব আসছে যে সামলান দায়। তাই ভাবি যে, ঠাকুরের কি ইচ্ছে! এমনও এক দিন গিয়েছে যখন বরাহনগর মঠে থাকতে একখানা কাপড়ই সকলে মিলে পরতাম। আর এখন নিত্য নূতন গরদ পরলেও ফুরোয় না। তবে কি জানিস্, তাঁর দয়ায় মনটা তখনও যা ছিল এখনও তাই। পরনের কাপড় ছিল না বলে মনে কোন দুঃখ ছিল না, কোন অভাব বোধ হত না। তিনি কৃপা করে ভরপূর আনন্দ দিয়েছিলেন। এই দেখ্ না, তোরা তো এখন আমায় দু হাত গদির উপর শুইয়ে রেখেছিস্; কিন্তু আমার মনে হয় সেই কাশীর কথা যখন শীতকালে কেবল খড় পেতে তার উপর শুয়ে থাকতাম্। তাতে যা আনন্দ তা এর সঙ্গে তুলনাই হয় না।"

* * * *

একদিন সকালে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন করে দিয়ে সেবক নিত্যকার মত তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন; কিন্তু সেদিন সেবককে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে তিনি বল্লেন—"থাক না, তাতে আর হয়েছে কি? দীক্ষার মন্ত্র কে না জানে? আর ওসব মন্ত্র তো বইতেই ছাপা আছে। তবে কি জান বাবা, ঐ মন্ত্রই সিদ্ধগুরুর মুখ থেকে বেরুলে তাতে মন্ত্র

চেতন হয়। নইলে তো ওটা শব্দ মাত্র। গুরু নিজ শক্তিবলে মন্ত্র চৈতন্য করে দেন; আর শিষ্যের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রতা করে দেন। এই হল আসল ব্যাপার।"

* * * *

নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণ যেন শ্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁদের সাহচর্য ও সেবা জীবকে ভগবৎসান্নিধ্যে নিয়ে যায়; কিন্তু তাঁদের সেবা বা সঙ্গ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বরং দেববিগ্রহের সেবাপূজাদি সে তুলনায় অতি সহজ। সাধনভজন দ্বারা শুদ্ধচিত্ত না হলে মহাপুরুষদের প্রকৃত সেবা করা সম্ভব নয়। আর চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন না হয়ে মহাপুরুষদের সেবা করতে গেলে তাতে সেবা-অপরাধ হবার খুবই সম্ভাবনা।

মহাপুরুষ মহারাজের জনৈক সেবক নিজকে সেবা-অপরাধে অপরাধী মনে করে একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল—"মহারাজ, আপনার সেবা করতে অনেক সময়ই বহু ত্রুটী হয়ে যায় যাতে আপনিও খুব বিরক্তি প্রকাশ করেন। আপনারা সত্যসঙ্কল্প, আপনাদের মুখ দিয়ে যা বেরুবে তা তো সত্য হয়ে যাবে এবং আপনাদের অসন্তুষ্টিতে আমাদের মহা অকল্যাণ হবে নিশ্চয়। এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।" সেবকের কথা শুনে মহাপুরুষজী খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে মৌন হয়ে রইলেন। স্নেহ ও করুণায় তাঁর মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় আভা ফুটে বেরুতে লাগল। পরে খুবই আবেগভরে স্নেহপূর্ণ স্বরে বল্লেন—"দেখ বাবা, ঠাকুর এসেছিলেন

জগতের কল্যাণের জন্য। আমরাও তাঁরই সঙ্গে এসেছি। জীবের কল্যাণ-কামনা ছাড়া আর কোন কামনা আমাদের নেই। স্বপ্নেও কখনও কারো অকল্যাণ কামনা করি নে। আর ঠাকুরও আমাদের দ্বারা কারো কোন প্রকার অনিষ্ট বা অকল্যাণ হতে দেবেন না। তোমরা আমার কাছে রয়েছ, সর্বক্ষণ আমার সেবা করছ, তোমাদের ভালমন্দ সমস্ত ভার ঠাকুর আমার ওপর দিয়েছেন। সে জন্য তোমাদের ত্রুটী বিচ্যুতি সব শুধরে নিতে হচ্ছে। তোমাদের ভালর জন্যই অনেক সময় গালমন্দ পর্যন্ত করি; কিন্তু সে সবই বাহ্যিক। অন্তরে আছে স্নেহ, ভালবাসা আর দয়া। নইলে কাছে রাখা কেন? এ খুব জানবে যে, সবই তোমাদের ভালর জন্যই করি। তোমাদের শোধরাবার জন্য, তোমাদের জীবনের গতি যাতে সর্বতোভাবে ভগবন্মুখী হয় সেজন্য প্রয়োজন বোধে অনেক সময় কঠিন ব্যবহারও করে থাকি এবং কেন ওসব করি তাও বেশ ভাল করে জেনেই করে থাকি। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নয়। ঠাকুরের কাছে তোমাদের কল্যাণের জন্য কত যে প্রার্থনা করে থাকি তার এতটুকু যদি জানতে তা হলে তোমার মনে এমন আশঙ্কা কখনই উঠত না। তা ছাড়া—'ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ' —আমাদের ক্রোধও বরের মত জানবে।"

* * *

শেষ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হবার কয়েক মাস পূর্বে মহাপুরুষ মহারাজ সেবার বেলুড় মঠে প্রতিমায় বাসন্তী পূজা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু সময়ের সংকীর্ণতার দরুণ তা আর

সম্ভব হয় নি। সে সম্বন্ধে একদিন কথা প্রসঙ্গে জনৈক সেবক বলেছিল—"মহারাজ, আপনার যখন ৺বাসন্তী পূজা করার বাসনা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।" সেবক খুব সাধারণ ভাবেই একথা বলেছিল, কিন্তু "আপনার বাসনা হয়েছে" একথা শুনে তিনি যেন চমকে উঠে বল্লেন—"এ্যাঁ, কি বললি? বাসনা? আমার বাসনা হয়েছিল? ঠাকুরের কৃপায় আমার কোন বাসনা নেই। বিন্দুমাত্রও নয়।" তখন সেবক নিজের ভুল বুঝতে পেরে বল্লে—"না মহারাজ, আপনার শুভ ইচ্ছা যখন হয়েছে—।" তখন তিনি বল্লেন—"হাঁ, আমাদের শুভ ইচ্ছায় তাঁর কৃপায় সব হতে পারে। কিন্তু আমার ঠাকুর ছাড়া পৃথক্ অস্তিত্বও নেই আর আলাদা কোন ইচ্ছেও নেই। তাঁর ইচ্ছে যা হয় তাই হবে।" কথা সামান্য কিন্তু এতেই বেশ বোঝা যায় যে, তিনি কায়মনোবাক্যে কতদূর ঠাকুরগত প্রাণ ছিলেন, আর ঠাকুরের সঙ্গে কতটা একাত্মবোধ নিয়ে এবং কতটা অহঙ্কারশূন্য হয়ে এ জগতে ছিলেন।

বেলুড় মঠ

বুধবার, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩২

বিকেল বেলা মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক সেবককে বল্লেন—"শ্রীমদ্ভাগবত নিয়ে এসো তো; একটু অজামিল উপাখ্যান শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।" তদনুসারে ভাগবত এনে পাঠ শুরু হল।

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন—"হে মহাভাগ!

মানুষ পাপকর্ম হতে কি প্রকারে বিরত হতে পারে? এবং নিজ পাপকর্মজনিত বিবিধ উগ্র যাতনাপূর্ণ নরকভোগ হতেই বা কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব?" তদুত্তরে শুকদেব বল্লেন— "অগ্নি যেমন বৃহৎ বেণুগুল্মকে দগ্ধ করে, তেমনি শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণও তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শম, দম, ত্যাগ, সত্য, শৌচ, যম, নিয়ম ইত্যাদি সহায় করে বুদ্ধি ও বাক্যকৃত সমূহ পাপ বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়।" কিন্তু এ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত খুবই কঠিন; সেজন্য সর্বশেষে ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ করে বলছেন—

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব পরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কাৎর্স্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥"

অর্থাৎ সূর্যোদয়ে কুজ্ঝটিকারাশি যেমন বিদূরিত হয়, তেমনি বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তিগণ কেবল একান্ত ভক্তি দ্বারাই সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরে অজামিলের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। অজামিল সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু পরে নিজ বিবাহিত সতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে এক সুরাপায়ী দাসীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন এবং ক্রমে অক্ষক্রীড়া, কপটতা, বঞ্চনা ও চৌর্য প্রভৃতি কলুষিত বৃত্তিতে আসক্ত হয়ে সমগ্র জীবন নানাবিধ পাপকর্মে লিপ্ত থাকেন। অজামিলের দশ পুত্র। সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ। তাকেই অজামিল সব চাইতে বেশী স্নেহ করতেন। অষ্টাশীতি বৎসর বয়সে অজামিল যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন উগ্রমূর্তি যমদূতদের দেখে ভয়ে নিজ পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলে ডাকতে লাগলেন। অন্তিম সময়ে 'নারায়ণ' শ্রীভগবানের এই নাম উচ্চারণ করার ফলে

তখনই বিষ্ণুদূতগণ এসে অজামিলের আত্মাকে যমদূতদের হাত থেকে মোচন করে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ খুবই তন্ময় হয়ে অজামিল উপাখ্যান শুনছিলেন। সর্বশেষে পাঠ হল—

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"

অর্থাৎ হে রাজন্! শ্রদ্ধাহীন অজামিল মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্রের নামে ভগবানের নাম উচ্চারণ করেও ভগবদ্ধামে গিয়েছিল; আর যাঁরা শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের নাম কীর্তন করেন তাঁরা যে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করবেন তাতে আর সন্দেহ কি? মহাপুরুষজী খুবই অভিভূত হয়ে বল্লেন—"আহা! দেখ, ভগবানের নামের কী অদ্ভুত শক্তি! বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার, কি সুন্দর কথা! তাই তো ঠাকুর বলতেন—'নাম-নামী অভেদ।' এ খুব পাকা কথা। ঐ নামের মধ্যেই তো সব; নাম ব্রহ্ম। তিনি নামের মধ্যে বাস করেন। যেখানে ভগবানের নাম কীর্তন হয় সেখানে ভগবান সর্বদা বিরাজ করেন।

'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম্ হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।'

ভগবান নারদকে বলছেন "হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও বাস করি না, কিন্তু যেখানে আমার ভক্তগণ আমার নাম গান করে আমি সেখানে অবস্থান করি।" ঠাকুর খুব হরিনাম করতে বলতেন। তিনি বলতেন—'গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে যেমন গাছের

সব পাখী উড়ে পালায় তেমনি হরিনাম করলেও দেহের সব পাপ চলে যায়।' ঠাকুর নিজেও হাততালি দিয়ে খুব নাম করতেন। যখন নাম করতে শুরু করতেন তখন ভাবস্থ হয়ে অবিরাম নাম করে যেতেন। তাঁর সবই ছিল অদ্ভুত।"

সেদিন অজামিল-উপাখ্যান শুনে মহাপুরুষজী এত খুসী হয়েছিলেন যে, পরে যারাই তাঁকে দর্শন করতে আসছিল সকলকেই ঐ ভাগবত পাঠের কথা আনন্দ করে বলছিলেন।

বেলুড় মঠ

বুধবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩২

সারাদিনই ভক্ত ও দর্শকের ভিড় সমভাবেই চলেছিল। ঢাকার জনৈক ভদ্রলোক তাঁর পরলোকগত ছেলের বাক্সে মহাপুরুষ মহারাজের ফটো ও জপমালা দেখতে পেয়ে বিকেল বেলা স্বতঃ-প্রণোদিত হয়েই মহাপুরুষজীকে দর্শন করতে এসেছেন। তিনি ছেলেটির মৃত্যুর সব ঘটনা বলে ছেলের জন্য খুবই শোক প্রকাশ করতে লাগলেন। মহাপুরুষজী ধীরভাবে সব শুনে পরে বললেন— "আপনার ছেলে ভগবদ্‌ভক্ত ছিল; তার আত্মার নিশ্চয়ই সদ্গতি হয়েছে। সে মহা ভাগ্যবান; তার জন্য আপনি শোক করবেন না। সে খুবই শুভ সংস্কার নিয়ে জন্মেছিল; তাই অল্প বয়সেই ভগবানে মতিগতি হয়েছিল এবং তার জীবনের যা উদ্দেশ্য ছিল তা সাধন করে স্বধামে চলে গেছে। তা ছাড়া 'জন্মমৃত্যু'

শিবানন্দ-

এতে মানুষের কোন হাত নেই—এসব ঈশ্বরেচ্ছাধীন। তিনিই জানেন কাকে কতদিন এ সংসারে রাখবেন। সব দেহেরই নাশ আছে; এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও নেই। ছেলে গিয়েছে; আপনাকেও একদিন যেতে হবে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা যাদের আপনার জন মনে করছেন সকলকেই যেতে হবে। কেউ চিরকাল থাকবে না। গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।' যে ব্যক্তি জন্মেছে তার মৃত্যু ধ্রুব; তাই সেই অপরিহার্য বিষয়ের জন্য শোক করতে বারণ করছেন। মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি বলুন তো? ভগবান লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য—তা ছেলে, পরিবার ইত্যাদি থাক আর যাক। প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী। ছেলের সুকৃতি ছিল; তার সদ্গতি হয়ে গেছে। এখন আপনার নিজের যাতে সদ্গতি হয় তাই করুন। আপনার স্ত্রীকেও তাই বলুন। শুধু বললে কি হবে—করতে হবে। খুব রোখ করে ভগবান লাভ যাতে হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। লেগে যান আজ থেকেই—পলে পলে জীবন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কার যে কখন মরতে হবে তা কেউ জানে না; অতএব একদিনও বৃথায় যেতে দেবেন না। যারা ভাবে যে, ওসব পরে করা যাবে তাদের কখনও হয় না। তারা এ জন্মমৃত্যুর প্রবাহের মধ্যে অনন্তকাল হাবুডুবু খাবে।"

পরে খুবই ভাবের সহিত গাইলেন—

"'ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলো না দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়া জালে॥

যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে॥
দিন দুই তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে।
সে কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে॥'

"সংসারে যাদের আপনার ভাবছেন তারা কেউই আপনার নয়। একমাত্র আপনার জন হলেন শ্রীভগবান। তিনি জনম মরণের সাথী, জীবের অন্তরাত্মা। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ চিরকালের।"